সাহারা

বঙ্গবাসী কলেজের প্রোফেসার

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যারত্ন এম্ এ প্রণীত।

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্

কলিকাতা

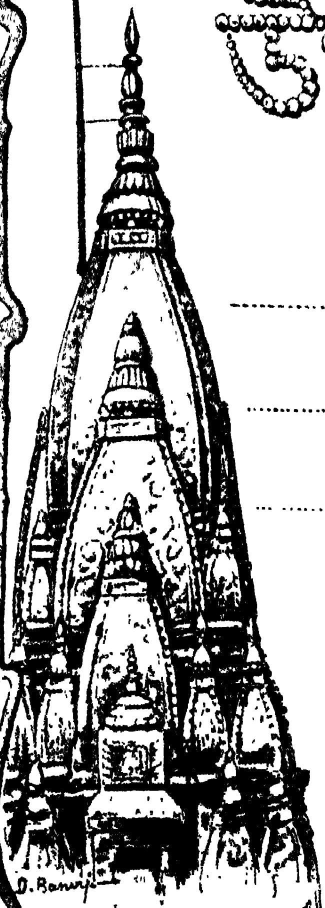
১৩০[illegible]

কলিকাতা

১৬।১নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌এর পুস্তকালয় হইতে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য-কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং
১০৮ নং নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, স্বর্ণপ্রেসে
শ্রীশিবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য-কর্ত্তৃক মুদ্রিত

৩য় সংস্করণ

উপহার



নিবেদন

'**ফোয়ারা**'য় বলিয়াছিলাম যে মরুভূমিতে ফোয়ারার ন্যায় আমার মত 'শিক্ষকের শুষ্কজীবনেও মাঝে মাঝে ভাবের ফোয়ারা খেলে।' '**পাগলা ঝোরা**'য়ও তাহারই জের চলিয়াছিল, তবে শেষ দিকে 'বিশ্বেশ্বরের বিধানে আমার হাসির ফোয়ারা শুকাইয়াছে।' এক্ষণে চক্রীর চক্রের পুনঃপুনঃ আবর্ত্তনে আমার জীবন সম্পূর্ণভাবে '**সাহারা**'য় পরিণত হইয়াছে। সুতরাং এই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলি ঐ নামে অভিহিত হইল। এ অবস্থায় পূর্ব্বের মত ষোল ধারা, আঠারো ধারা, বা বিশ ধারা (বিষ-ধারা নহে) কোথা হইতে আসিবে? কষ্টে-সৃষ্টে বারো ধারা, তাহার সঙ্গে 'শেষ কথা' যুড়িয়া দিয়া যোগে-যাগে তেরো ধারা, এবং অপরের নিকট ধার-করা একটি ধারা গছাইয়া দিয়াও যোড়া-তাড়া দিয়া চৌদ্দ ধারার বেশী আর যুটিল না। অপরেরটি বাদ দিলে অন্যগুলিতে নির্ম্মল রসধারা অপেক্ষা ফেনার পরিমাণই বেশী।

মরুভূমিতে মৃগ-তৃষ্ণিকার বিড়ম্বনা আছে। 'সাহারা'য়ও তাহার অভাব নাই। দূর হইতে দেখিলে যাহা স্বাদু স্নিগ্ধ বারিধারা বলিয়া মনে হইবে, নিকটে গেলে দেখিবেন তাহা ধূ-ধূ বালি ভিন্ন আর কিছুই নহে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলিতে পারি, 'ভোজন-সাধন' নাম দেখিয়া এক শ্রেণীর পাঠকের কত না উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তি হইবে, কিন্তু পাঠান্তে দেখিবেন, ইহা ভোজনের ছেঁদো কথায়ই পর্য্যবসিত। কাযে কিছুই নাই,—অর্থাৎ প্রবন্ধের কোথাও মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ-পত্র নাই! আরব্যোপন্যাসের Barmecide feastএর ন্যায়, গ্রাম্য প্রবাদ-বাক্যের 'মনে মনে রসবড়া খাওয়া'র ন্যায়, এ সব নিতান্তই বাজে বকুনি, ফাঁকা আওয়াজ, 'মধু নাইকো শুধুই তুলো'।

যাঁহারা সাহিত্যের রসাল ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নাম আমদানি করিলে রসভঙ্গের আশঙ্কা করেন, তাঁহারা না হয় ধরিয়া লইবেন যে আগাগোড়াই আহারের ব্যাপারের আলোচনা আছে বলিয়া পুস্তকের নাম 'সা-হারা।' (শেষের 'আ'-কারটি বাঙ্গালা ভাষার 'বিশেষত্ব'; যথা,—সুন্দরাকাণ্ড, উত্তরাকাণ্ড, কাশীপরিক্রমা প্রভৃতি।—ইতি 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা'-কারের টিপ্পনী)। ফল কথা, ইহাতে কাব্যের নবরস না পাইলেও চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয়ের ষড়্‌রসের আশা করা অসঙ্গত হইবে না।

বলা বাহুল্য, প্রবন্ধগুলি নিতান্ত একঘেয়ে। তথাপি সহৃদয় পাঠক যদি এতৎপাঠে কিঞ্চিৎ কালও অতিবাহিত করিতে পারেন ও কণামাত্রও আনন্দ আদায় করিতে পারেন, তাহা হইলে লেখকের আয়াস নিতান্ত পণ্ড-শ্রম হইবে না। আনন্দের সহিত শিক্ষাদান লেখকের উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং কেহ যেন এই পুস্তক হইতে শিক্ষালাভের আশা না করেন। বিলাতী সুলেখক (সম্প্রতি পরলোকগত) Jerome. K. Jeromeএর কথায় বলি,—

What readers ask nowadays in a book is that it should improve, instruct and elevate. This book wouldn't elevate a cow. I cannot conscientiously recommend it for any useful purpose whatever. All that I can suggest is that when you get tired of reading "the best hundred books," you may take this up for half-an-hour. It will be a change.—[*Preface to* THE IDLE THOUGHTS OF AN IDLE FELLOW, *A Book for an Idle Holiday.*]

কলিকাতা
১লা আশ্বিন ১৩৩৪

শ্রীললিতকুমার শর্ম্মা

৺কাশী-বিশ্বেশ্বরের স্মৃতি ইদানীং মনে আসিলেই
যাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি ও স্নিগ্ধ কথালাপের স্মৃতিও উজ্জীবিত হয়,

৺কাশীবাসকালে যাঁহার সঙ্গ-সুখে কখনও বা ধন্য
কখনও বা বঞ্চিত হইয়াছি,

'যাঁহার 'কাশীর কিঞ্চিৎ' হইতে বঙ্গীয় পাঠক
৺কাশীর জীবন-বৈচিত্র্যের অপূর্ব্ব আস্বাদ পাইয়াছেন,

'সাহারা'র প্রবন্ধাবলি-রচনায়
যাঁহার সাহায্য ও সমবেদনা-লাভে কৃতার্থ হইয়াছি,

সেই সরস সাহিত্যস্রষ্টা, সাহিত্য-রসিক
ও সাহিত্য-সেবায় উৎসৃষ্টপ্রাণ,

'কাশীর কিঞ্চিৎ'এর নন্দিশর্ম্মা,
'চীনযাত্রা'র 'যাত্রী,' 'শেষ খেয়া'র খেয়ারি,
'কোষ্ঠীর ফলাফলে'র ব্যাখ্যাতা
'আমরা কি ও কে' ইত্যাকার প্রশ্নের উত্থাপক ও মীমাংসক,

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের করকমলে

এই সামান্য পুস্তকখানি
শ্রদ্ধা, প্রীতি, মৈত্রী ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ
উপহার দিলাম। ইতি

কলিকাতা
১লা আশ্বিন ১৩৩৪

গ্রন্থকার।

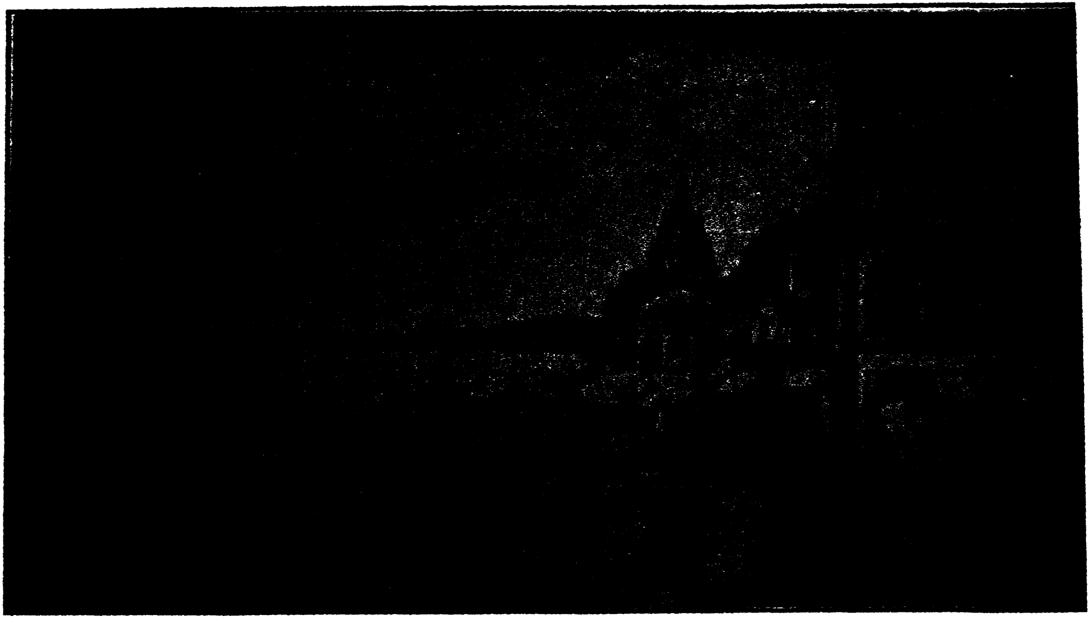
সূচীপত্র

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

ফোয়ারা (শোভন চতুর্থ সংস্করণ, পরিশিষ্ট-সমেত)	১॥০
পাগলা ঝোরা (দ্বিতীয় সংস্করণ, পরিবর্দ্ধিত)	২৲
কাব্যসুধা (ননদ-ভাজ ইত্যাদি বঙ্কিম-সমালোচনা)	১৲
কপালকুণ্ডলা-তত্ত্ব (২য় সংস্করণ, পরিবর্দ্ধিত)	॥০
অনুপ্রাস (চারিবর্ণে মুদ্রিত হরগৌরীর চিত্র-সমেত)	॥০
সখী (বঙ্কিম-সমালোচনা)	॥০
প্রেমের কথা	॥০
মোহিনী (ছোট গল্প)	॥০
ককারের অহঙ্কার (২য় সংস্করণ)	।/০
ব্যাকরণ-বিভীষিকা (৩য় সংস্করণ, পরিবর্দ্ধিত)	॥০
বাণান-সমস্যা (২য় সংস্করণ)	।০
সাধুভাষা বনাম চলিতভাষা	৵০
* ছড়া ও গল্প (৫ম সংস্করণ)	॥০
* আহ্লাদে আটখানা (৩য় সংস্করণ)	॥০
* রসকরা	॥০
* সাত নদী	॥৵০

* বালকবালিকাদিগের পাঠ্য।

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
১৬৷১ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।



৺কাশী— বর্ষার গঙ্গা

সাহারা

কাশীর বৈশিষ্ট্য

('ভারতবর্ষ', কার্ত্তিক ১৩৩০)

[বৎসরাধিক কাল পরে—(এই দীর্ঘকাল রোগশোকার্ত্ত লেখকের নিকট দীর্ঘতর প্রতীয়মান হইয়াছে)—আবার 'ভারতবর্ষে' দর্শন দিলাম, পাঠক-নারায়ণের নিকট অর্ঘ্য লইয়া অগ্রসর হইলাম। কিন্তু যে স্ফূর্ত্তি ও আনন্দে আমোদর শর্ম্মার বেনামীতে 'বিষবৃক্ষের উপবৃক্ষে'র চাষ করিয়াছিলাম, 'বঙ্কিম-চর্চ্চরী' বানাইয়াছিলাম এবং 'বিচিত্র বর্ণবোধে'র সচিত্র পরিচয় দিয়াছিলাম, অথবা স্বনামীতে 'বিবাহে বিবিধ বাধা' ঘটাইয়াছিলাম ও 'ধর্ম্মে মতি' স্থির রাখিয়াছিলাম, সে স্ফূর্ত্তি সে আনন্দ আর নাই।[১] আবার যে শ্রম ও অধ্যবসায়-সহকারে 'সতীন ও সৎমা', 'মা', 'ছদ্মবেশ', 'সখী', 'প্রেমের কথা' ও 'বিধবা'-বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা মাসের পর মাস চালাইয়া পাঠক-সম্প্রদায়ের ধৈর্য্য-পরীক্ষা করিয়াছিলাম, সে শ্রমশীলতা ও অধ্যবসায়ও আর নাই। আজ এই গ্রহ-নিগৃহীত লেখক রোগজীর্ণ-দেহ, শোকদীর্ণ-হৃদয়। যাক্, নিজের ব্যক্তিগত জীবনের নিদারুণ করুণ কাহিনী বর্ণনা করিয়া পাঠকের মনে অনর্থক কষ্ট দিতে চাহি না, পাঠকের হৃদয়ে সমবেদনার উদ্রেক করিতেও চাহি না। দীনের এই অর্ঘ্যে তুলসীচন্দন ও উদ্যান-জাত মনোহর সুরভিসার পুষ্পসম্ভার নাই, আছে শুধু বিল্বদল ও গঙ্গাজল—তবে সে বিল্বদল 'আনন্দ-কাননে' চয়ন করিয়াছি, সে 'গঙ্গাজল-লব-কণিকা' 'কাশীতলবাহিনী গঙ্গা' হইতে উত্তোলন করিয়াছি। ইতি মুখবন্ধ।]

---

(১) উল্লিখিত প্রবন্ধগুলি 'পাগলা ঝোরা'য় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। 'সখী' ও 'প্রেমের কথা' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। অবশিষ্টগুলি আজও স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হয় নাই।

'সা কাশী ত্রিপুরারিরাজনগরী পায়াদপায়াজ্জগৎ।'

বিষয়—আমার সেই চিরপ্রিয়, চিরশ্রেয়ঃ, চির-আকাঙ্ক্ষিত, চির-আরাধিত কাশী, হিন্দুর কাছে চির-পুরাতন, চিরনূতন, 'সকল তীর্থের রাণী' কাশী। কাশী, বারাণসী, অবিমুক্তক্ষেত্র, রুদ্রাবাস. মহাশ্মশান, আনন্দ-কানন, স্বর্গভূমি—কাশীর কতই নাম! কিন্তু আমার কাছে—ভক্ত হনুমানের কাছে যেমন 'রামঃ কমললোচনঃ'[২] তেমনি—'কাশী' এই দুই অক্ষরে ছোট্ট সুখোচ্চার্য্য নামটিই সব চেয়ে মিষ্ট লাগে। তাই প্রবন্ধের নামকরণে 'বারাণসীর বৈশিষ্ট্য' বসাইলে যদিও অনুপ্রাস সুপ্রকাশ হইত, তবুও সে লোভ সংবরণ করিয়াছি।

অনেক কাল হইতে এই পুণ্যধামে অনেকেই আসিয়াছেন। বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধদেব, শিবাবতার শঙ্করাচার্য্য, কবীর, তুলসীদাস, শ্রীগৌরাঙ্গ, ত্রৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ-স্বামী, বিশুদ্ধানন্দস্বামী, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কৃষ্ণানন্দস্বামী ইত্যাদি অনেক দেবাত্মা বা দেবকল্প মহাপুরুষ কাশীধাম দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন, কাশীধামকেও ধন্য করিয়াছেন। দুইজন জৈন তীর্থঙ্কর—সুপার্শ্ব ও পার্শ্বনাথ—এই পুণ্য-ভূমিতেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আবার বিদেশ হইতে, সেকালের চৈনিক পরিব্রাজক ধার্ম্মিকপ্রবর হিউএন্ সিয়াং, একালের মার্কিন পর্য্যাটক রসিকপ্রবর মার্ক্ টোয়েন্, প্রাচ্যের মোহমুগ্ধ ফরাসী লেখক পিয়ের্ লোটি, প্রাচ্যকলার পক্ষপাতী সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক সহৃদয় ইংরেজ হেভেল্ (Havell) সাহেব, হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী স্থূলদর্শী খ্রীষ্টান্ মিশনারি পাদরী—ইঁহারাও আসিয়া 'ভুবনসুন্দরী বারাণসী'র সৌন্দর্য্য-গাম্ভীর্য্য দেখিয়া

---

(২) শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ॥

চমৎকৃত হইয়াছেন, কাশীদর্শনে ইঁহাদিগেরও হৃদয়-ফলকে একটা গভীর ছাপ (profound impression) পড়িয়াছে। সেকেলে 'পৌত্তলিক' প্রৌঢ় মহারাজ ৺জয়নারায়ণ ঘোষাল শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে একরূপ চোখে কাশী দেখিয়াছেন,[৩] আর একেলে 'অপৌত্তলিক হিন্দু' মহর্ষি ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র যুবা ৺বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর একরূপ চোখে কাশী দেখিয়াছেন;[৪] কিন্তু উভয়েই কাশীর সৌন্দর্য্য-গাম্ভীর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার গুণগান করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমনে'র রিপোর্টার্ কাশীর উল্টা পিঠটা মসীলাঞ্ছিত করিয়াছেন। আবার হালে 'নন্দিশর্ম্মা' 'কাশীর কিঞ্চিৎ'-অবলম্বনে রসরঙ্গের হোলি খেলিয়াছেন। সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র অতি অল্পকথায় 'বিষবৃক্ষে',[৫] শ্রীমতী নিরুপমা দেবী 'দিদি'তে, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 'অদৃষ্টচক্রে', এবং আরও অনেক ছোট বড় মাঝারি গল্প-লেখক নানা গল্পে কাশীর মহৎ ও মোহন চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

বর্ত্তমান লেখক 'তীর্থদর্শন', 'বারাণসী-দর্শনে', 'সুখের প্রবাস', 'ধর্ম্মে মতি', 'কাশীবাস' এই রচনা-পঞ্চকে[৬] কাশী-সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার যে কাশীর প্রতি কতদূর প্রবল প্রাণের টান, ইহা যদি পাঠক সম্প্রদায় প্রণিধান করিতে না পারিয়া থাকেন, তবে বৃথাই এই অধন্য লেখকের লেখনীধারণ।

---

(৩) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'কাশী-পরিক্রমা' দ্রষ্টব্য।

(৪) স্বল্পায়ুঃ বলেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলি (৫৫৭-৬৩ পৃঃ) বা ঠাকুরবাড়ী হইতে প্রকাশিত স্বল্পায়ুঃ (আমাদের যৌবনকালের বড় সাধের) 'সাধনা,' পৌষ ১৩০০, (১৫৬-৬৩ পৃঃ)— 'বারাণসী'-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(৫) আশাপথে, পঞ্চত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

(৬) প্রথম তিনটি 'ফোয়ারা'য় ও শেষের দুইটি 'পাগলা ঝোরা'য় দ্রষ্টব্য।

যাহা হউক, এবার দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশে কাশীতে আসিয়া, দীর্ঘকাল রোগশয্যায় পড়িয়া থাকিয়া, কাশীর বৈশিষ্ট্য যে ভাবে উপলব্ধি করিয়াছি, যে ভাবে মনের উপর ছাপ পড়িয়াছে, সে ভাবে সে চক্ষে পূর্ব্বে কখনও কাশী দেখি নাই। (যদিও পূর্ব্বে বহুবার অল্প বা অধিক দিনের জন্য কাশীবাসের সৌভাগ্য-লাভ ঘটিয়াছে)। রোগের তীব্র যাতনা-জনিত মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিই কি ইহার কারণ? না, 'জরারোগগ্রস্তঃ মহাক্ষীণ-দীনঃ বিপত্তৌ প্রবিষ্টঃ' হওয়াতে আজ অন্তশ্চক্ষুঃ ফুটিয়াছে?

কাশী হিন্দুর মহাতীর্থ হইলেও এখানে যে শুধু হিন্দুরই বাস, তাহা নহে। হিন্দুর 'ধর্ম্মধানী'তে [৭] ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর অভাব নাই। ষ্টেশন্ হইতে গাড়ী করিয়া আসিয়া গোধূলিয়া পর্য্যন্ত পৌঁছিলেই খ্রীষ্টানের গির্জ্জা নয়ন-গোচর হয়; ইহা ছাড়া সহরের অন্যান্য মহল্লায়ও গির্জ্জা, মিশনারি স্কুল্ প্রভৃতি আছে। আবার বিশ্বেশ্বরদর্শনে গেলে তাহার অদূরেই ঔরঙ্গজেবের আমলের মসজিদ দেখিতে পাওয়া যায়; বিন্দুমাধব ('বেণী-মাধব')-দর্শনে গেলেও মুসলমানের কীর্ত্তি চক্ষে পড়ে; যাহাকে সাধারণ লোকে 'বেণীমাধবের ধ্বজা' বলে সেটি হিন্দুর দেবতার বিজয়-কেতন নহে, মুসলমানের মসজিদের মহোচ্চ মিনার। যাঁহারা কাশীতে নূতন আসিয়া দশাশ্বমেধ-ঘাটের দক্ষিণ-পার্শ্ববর্ত্তী শীতলাঘাটে [৮] স্নান করেন—এই ঘাটটিই স্নানের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক, 'বাঙ্গালী-পছন্দ' ঘাট—তাঁহারা

---

(৭) 'ধর্ম্মধানী' ও 'দেবধানী' বলেন্দ্রনাথের 'বারাণসী'-প্রবন্ধে পাইয়াছি। বৈয়াকরণ কি বলেন?

(৮) ইহা প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যা-বাঈএর কীর্ত্তি। এই ঘাটের উপর ৺শীতলা দেবীর ও ৺দশাশ্বমেধেশ্বর শিবের মন্দির আছে। এই ঘাটের ঘাটোয়াল 'বিন্দু মহারাজ' অতি সজ্জন ছিলেন; বৎসরাধিক হইল তাঁহার ৺কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছে।

বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে এই ঘাটের দক্ষিণে যে ঘাট (মুন্সীঘাট), সেটি মুসলমানদিগের একরকম একচেটিয়া। বঙ্গ-সীমন্তিনীগণ যে বেনারসী শাড়ীকে সুখ-সৌভাগ্যের চরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু মনে করেন, তাহা কাশীস্থ মুসলমান 'জোলা'দের হাতের তৈয়ারি। বাস্তবিক, এই মুসলমান 'জোলা'রা শুধু কাশীর কেন, ভারতের গৌরবের নিদান, কেননা ইহাদিগের প্রস্তুত সুবর্ণখচিত কিঙ্খাব প্রতীচীতে আদর ও খ্যাতিলাভ করিয়াছে, ভারতীয় শিল্পের নিদর্শন-দর্শনে পাশ্চাত্য জাতিগণ বিস্ময়াভিভূত হইয়াছে। আবার শুধু খ্রীষ্টান্-মুসলমান কেন, নানকপন্থী, কবীরপন্থী, দাদুপন্থী প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকই কাশীতে আছে। 'কাশী-পরিক্রমা'য় ইহার স্বরূপবর্ণন আছে—

"রামানন্দী, শ্যামানন্দী, নিমানন্দী কত।
নানক, কবীরপন্থী, অঘোর সম্মত॥
ফকির, সুথরাসাহী, বৌদ্ধ যতিগণ।" ইত্যাদি।

কিন্তু আমি কাশীকে বিশেষভাবে হিন্দুর বাসভূমি বলিয়াই ধরিতেছি।

এই কাশীস্থ হিন্দুর মধ্যে আবার দুই শ্রেণী আছে। এক শ্রেণীর হিন্দু 'পশ্চিমে'র অন্যান্য সহরের ন্যায় কাশীতে বিষয়কর্ম্ম-উপলক্ষে বাস করেন; ইঁহারা মোরাদাবাদ, মীরাট, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ, বেরিলী, লুধিয়ানা, দিল্লী, লাহোর, দেরা গাজি খাঁ, দেরা ইস্মাইল খাঁ প্রভৃতি সহরেও বাস করিতে পারিতেন, দৈবগত্যা কাশীতে বাস করিতেছেন। ইঁহারা, কলিকাতার আফিস্-ওয়ালাদের মত, সকালে সকালে কলের জলে স্নান সারিয়া চারিটি ভাত মুখে গুঁজিয়া চাকরীতে বা ব্যবসায়ে বাহির হইয়া যান। 'উত্তরবাহিনী' গঙ্গা বা বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণার সহিত ইঁহাদের কোনও সম্পর্ক নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। বড় জোর, বিশেষ বিশেষ পর্ব্ব-উপলক্ষে, ('জন্মের মধ্যে কর্ম্ম') ইঁহারা গঙ্গাস্নান ও দেবদর্শন করেন, এই পর্য্যন্ত।

কেহ কেহ বা নখের কোণ দিয়া গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া মস্তকে ছিটাইয়া (তাহাতে কেশাগ্রও ভিজে না) পতিতপাবনী সুরধুনীর সম্মানরক্ষা করেন। অনেকে গা ময়লা হইবার ভয়ে গঙ্গায় অবগাহন করেন না (বিশেষতঃ বর্ষাকালে), কাহারও কাহারও আবার শুনিয়াছি গঙ্গাস্নান সহে না, বুকে বেদনা, গলায় বেদনা, সর্দ্দিকাশী জ্বর হয়, এমন কি বাতে ধরে। যাহা হউক, আমি এই শ্রেণীর হিন্দুকে ঠিক কাশীবাসী হিসাবে দেখিতেছি না। ইঁহারা কাশীবাসী নহেন, কাশী-প্রবাসী ; ইঁহারা নামে হিন্দু, কামে—।

আমি বিশেষভাবে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই এই প্রবন্ধ লিখিতেছি, যাঁহারা অর্থকামের চিন্তায় ও চেষ্টায় নহে, ধর্ম্মার্থী মোক্ষার্থী হইয়া কাশীবাস করেন, স্নান-দর্শন-স্পর্শন-অর্চ্চন-ধ্যানধারণা যাঁহাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন, মুখ্য কল্প ; 'যাত্রা' করা যাঁহাদের নিত্যকর্ম্ম। কবির কথায় যাঁহাদিগের

অসারে খলু সংসারে সারমেতচ্চতুষ্টয়ম্।
কাশ্যাং বাসঃ সতাংসঙ্গো গঙ্গাম্ভঃ শম্ভুসেবনম্॥

ইঁহারাই প্রকৃত-পক্ষে 'কাশীবাসী' আর এই 'যাত্রা'ই কাশীর বৈশিষ্ট্য, অসাধারণত্ব, কাশীর 'জান' বা প্রাণ। ইঁহাদের কথা লিখিয়াই, ইঁহাদের দৈনন্দিন কর্ম্ম বর্ণনা করিয়াই, লেখনীর লেখনীজন্ম সার্থক করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, জীবন-সায়াহ্নে ইঁহাদের দলে ভিড়িতে পারিলেই জন্ম সফল বলিয়া মনে করিব। মনের প্রবল আকিঞ্চন, অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বর-চরণে হৃদ্‌গত নিবেদন,

"আমি কবে কাশীবাসী হ'ব ?
সেই আনন্দ-কাননে গিয়ে নিরানন্দ নিবারিব।
গঙ্গাজল-বিল্বদলে বিশ্বেশ্বর-নাথে পূজিব।
অই বারাণসীর জলেস্থলে ম'লে পরে মোক্ষ পাব।

অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠাত্রী স্বর্ণময়ীর শরণ ল'ব।
আর বম্ বম্ ভোলা ব'লে নৃত্য ক'রে গাল বাজাব ॥"

কিন্তু অন্নের সংস্থানের জন্যই অন্নপূর্ণার পুরী ছাড়িয়া অন্যত্র থাকা ভিন্ন উপায় নাই; সুতরাং হৃদয়ের এ আকাঙ্ক্ষা, আশা ও প্রয়াস 'উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে'। যাক্, ব্যক্তিগত কথা ছাড়িয়া প্রকৃত অনুসরণ করি।

প্রাতঃকাল হইতে, শ্রীবিষ্ণুঃ, প্রত্যূষকাল হইতে,—শিব শিব শিব, ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে এই 'যাত্রা' আরম্ভ হয়, আর দিবামানের প্রথম 'ছয় দণ্ড'-মধ্যে অর্থাৎ বেলা ৮টা ৯টায় শেষ হয়। যে যেমন সকাল উঠিতে পারে, যাহার যেমন অভ্যাস, অথবা যাহার যেমন ধর্ম্ম-কর্ম্মে আগ্রহের মাত্রা (degree), সে সেইরূপ সকালসকাল শয্যাত্যাগ করে। বলা বাহুল্য, প্রকৃত 'কাশীবাসী' সুখ-বিলাসী নিদ্রালস নহেন। পৌষ-মাঘে 'পশ্চিমে'র কন্‌কনে শীতেও এই নিয়মের ব্যত্যয় হয় না। শয্যাত্যাগের পর মুখ-প্রক্ষালন, দন্তধাবন ও শরীরের ধর্ম্মপালনের জন্য বিধেয় প্রাতঃকালীন কার্য্যানুষ্ঠান সমাধা করিয়া শুদ্ধবস্ত্র পরিধান ও শুষ্কবস্ত্র (অনেকেরই পট্টবস্ত্র ও নামাবলি), গামছা, ধাতুনির্ম্মিত কমণ্ডলু বা পঞ্চপাত্র ও সাজি ('পুষ্পপাত্র চন্দন-সহিত') তথা জপের মালা লইয়া 'কাশীবাসী' গৃহের বাহির হয়েন। কাশীতলবাহিনী উত্তর-বাহিনী পতিতপাবনী সুরধুনীর জলে অবগাহন-স্নান করিয়া কেহ আর্দ্রবস্ত্রে জলে জলে, কেহ শুষ্কবস্ত্রে পাটে বসিয়া (ধর্ম্মার্থীদের সুবিধার জন্য ঘাটোয়ালরা সযত্নে এই সব কাঠের পাট পাতিয়া রাখে), কেহ দেবমন্দিরে বসিয়া (যথা, পূর্ব্বোক্ত অহল্যা বাঈয়ের ঘাটে ৺শীতলামন্দিরে) আহ্নিক ও জপ সারিয়া লয়েন। দশাশ্বমেধ ও শীতলা-ঘাটেই অনেকে যান; বারবিশেষে, যথা সোমবারে কেদারঘাটে, মাসবিশেষে, যথা বৈশাখে মণিকর্ণিকায়, জ্যৈষ্ঠে

দশাশ্বমেধে, শ্রাবণে কেদারঘাটে, কার্ত্তিকমাসে পঞ্চগঙ্গায়,[১] পর্ব্ববিশেষে, যথা স্নানযাত্রায় ও রথযাত্রায় অসিসঙ্গমে, যাওয়ার নিয়ম। সাধারণতঃ, যাহার যে ঘাটের উপর ভক্তি বা ঝোঁক, অথবা যাহার বাসস্থানের যে ঘাট নিকট, সে সেই ঘাটেই স্নানাহ্নিক করে।

এইবার গঙ্গাতীর ছাড়িয়া গঙ্গাজলপূর্ণ কমণ্ডলু বা পঞ্চপাত্র-হস্তে ৺বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণার মন্দিরোদ্দেশে সকলের প্রয়াণ।

পথে সাক্ষি-বিনায়ক ও ঢুণ্টিরাজ (এবং শনৈশ্চর—'শনিচর') অবশ্য-দর্শনীয় ও পূজনীয়। বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণার মন্দিরে আরও অনেক দেবতা আছেন, বিশ্বেশ্বর-মন্দিরের পিছনে 'শিবের কাছারী' জ্ঞানবাপী

---

(১) ৺বিন্দুমাধবের মন্দির-নিম্নস্থ ঘাটকে (অর্থাৎ যে ঘাটের উপর 'বেণীমাধবের ধ্বজা' বিদ্যমান তাহাকে) 'পঞ্চগঙ্গা' বলে। সহধর্ম্মিণীর প্রমুখাৎ শুনিয়াছি, এই পঞ্চগঙ্গা-প্রয়াণ বড় আনন্দের ব্যাপার। সমস্ত কার্ত্তিক মাস ধরিয়া প্রভাতী তারা ডুবিয়া না যাইতে এইখানে ডুব দিতে হয়; সুতরাং অনেক রাত্রি থাকিতেই স্নানের সঙ্কল্প লইয়া বাহির হইতে হয়। প্রায় সকলেই একা, ক্বচিৎ এক পরিবারের পরিজন বা এক বাসার বাসিন্দা কয়েকজন দল বাঁধিয়া বাহির হয়, পথে যাইতে যাইতে ক্রমেই তাহারা দলে পুরু হয়। এই সব দলে পুরুষ বড় একটা থাকে না; অত রাত্রে সুখশয্যা ত্যাগ করা পুরুষের পোষায় না। স্ত্রীলোকদিগের এ সব বিষয়ে আগ্রহও বেশী এবং তাহারা অধিকতর কষ্টসহিষ্ণুও বটে। এই স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সধবা বিধবা, নবীনা প্রবীণা বৃদ্ধা, সব রকমই থাকে, তবে অধিকাংশই প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধা বিধবা। কেহ তন্ময় হইয়া জপ করিতেছে, কেহ মধুরকণ্ঠে নাম কীর্ত্তন করিতেছে, কেহ উচ্চৈঃস্বরে স্তব পাঠ করিতেছে, কেহ বা গুন্ গুন্ করিয়া, কেহ বা বেশ গলা ছাড়িয়া দিয়া, ধর্ম্মসঙ্গীত গাহিতেছে, আনন্দের রোল উঠিতেছে। লেখকের অবশ্য পরের মুখে ঝাল খাওয়া, শ্রীবিষ্ণুঃ—মিষ্টি চাখা; এখন তো রোগশয্যায় উত্থানশক্তি-রহিত, যখন সুস্থ সবল ছিলাম তখনও এত রাত্রি থাকিতে উঠিয়া স্নান না করি, এই মধুর কলধ্বনি শুনিবার, এই সুন্দর প্রাণস্পর্শী দৃশ্য দেখিবার প্রবৃত্তি হয় নাই। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি না থাকিলে তো এমন প্রবৃত্তি হইবে না।

মুক্তিমণ্ডপ প্রভৃতি বর্ত্তমান। অনেকে খুঁটাইয়া সবগুলিতেই যান। ঘাট হইতে মন্দিরের পথে ফুল-বিল্বপত্র কেনা হয়, সাজিতে আগে হইতেই আতপ-তণ্ডুল ('অক্ষত') থাকে, তাহার কিয়দংশ দেবোদ্দেশে অর্ঘ্যরূপে নিবেদিত হয়, কিয়দংশ ভিক্ষুক-নারায়ণকে প্রদত্ত হয়। দুইচারিটি দানামাত্র এক এক জন ভিখারীর ভাগ্যে পড়ে, কিন্তু বহুসংখ্যক যাত্রীর নিকট এইরূপ পাইয়াই ('অল্পানামপি বস্তূনাম্' ইত্যাদি, ভাষা-কথায় 'রাই কুড়িয়ে বেল') তাহাদের দিন-গুজরানের মত সংস্থান হয়—মা অন্নপূর্ণার এমনই কৃপা। কথায় বলে, অন্নপূর্ণার পুরীতে কেহ উপবাসী থাকে না। ফুল-বিল্বপত্র কেনার কথায় একটু বক্তব্য আছে। অত সকাল অন্য দোকানপাট খোলে না, (কাশীতে দোকানপাট কলিকাতা অপেক্ষা বেশ একটু বেলায়ই খোলে। দোকানীরাও স্নান-দর্শনান্তে অন্নসংস্থানে মন দেয়, এই কারণে কি?) কিন্তু ফুলওয়ালীরা তখনই গঙ্গাস্নানে যাইবার গলিরাস্তায় ও গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানে বসিয়াছে। [তাহারা অবশ্য অতি সাধারণ শ্রেণীর স্ত্রীলোক, অধিকাংশই বৃদ্ধা বা প্রৌঢ়া। কাব্যরসপিপাসু পাঠক তাহাদিগের মধ্যে কাব্যের নায়িকা 'রজনী' বা (Nydia) 'নিডিয়া' পাইবেন না।]

প্রাতে প্রধান দুইটি মন্দিরে (বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণার)—ভয়ানক ভিড়, ভুক্তভোগিমাত্রেই জানেন [১০]। ইহার অধিকাংশই স্ত্রীলোক, এবং তাহার অধিকাংশই আবার বৃদ্ধা। কিন্তু বৃদ্ধা বলিয়া তাহারা অথর্ব্ব নহে, বেশ

---

(১০) সৌখীন তীর্থযাত্রীদিগের পক্ষে একটু বেলা করিয়া যাওয়াই সুবিধা, অত ভিড় ঠেলিতে হয় না। দুপুরে লোক খুব কম থাকে। বৈকালে বাড়িতে আরম্ভ হয়, আরতির সময় আবার বিলক্ষণ ভিড় হয়। আরতিকালে নানাযন্ত্রের বাদ্যের সহিত পূজারীগণের সমস্বরে স্তব-পাঠ ভক্তিভাবে শুনিবার জিনিশ, ও দেবতার 'শিঙ্গার'-বেশ—দুগ্ধ-গঙ্গাজলে ধৌত, মাল্য-শোভিত, চন্দনচর্চ্চিত—ভক্তিভাবে দেখিবার জিনিশ।

শক্ত; তাহাদের কনুইএর ঠেলায় পুরুষদিগকে হঠিয়া যাইতে হয়। 'অবলা প্রবলা' এরকমটি আর কোথাও দেখি নাই। চণ্ডীতে লেখে, 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু'। আর অন্নদামঙ্গলে লেখে, 'মায়া করি' মহামায়া হইলেন বুড়ী'। (পৌরাণিক দশমহাবিদ্যার 'ধূমাবতী' স্মর্ত্তব্য।) সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে, অন্নপূর্ণার পুরীর বুড়ীরা জরতীবেশে তাঁহারই, শক্তিরই, অংশজাতা। এত ধাক্কাধাক্কি ঠেলাঠেলিতেও সকলেরই বিশ্বেশ্বর-দর্শন ও স্পর্শনের আগ্রহ অটুট। কেহ কেহ আবার উভয় দেবতার সঙ্কীর্ণ গর্ভগৃহে জপাদিও করেন। অবশ্য গর্ভগৃহের সম্মুখস্থ অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত স্থানে জপাদি করাই সুবিধা। তাহাও অনেকে করেন। প্রণাম-প্রদক্ষিণান্তে গৃহাভিমুখে প্রয়াণ।

এই তো গেল 'নিত্যযাত্রা'। ইহা ছাড়া তিথিবিশেষে, বারবিশেষে, মাসবিশেষে, পর্ব্ববিশেষে, অথবা 'মানসিক' থাকিলে, অথবা ইচ্ছাসুখে, অন্যান্য দেবমন্দিরে যাওয়া আছে। যথা, (শনি-মঙ্গলবারে) মানসকালী বা আশাকালী, (শীতলাষ্টমীতে) শীতলা, (শুক্লপক্ষের শুক্রবারে) সঙ্কটা-বীরেশ্বর, (সোমবারে) কেদার, (মঙ্গলবারে) বটুকভৈরব, কালভৈরব, কামাখ্যা, পশুপতিনাথ (শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত), বৈদ্যনাথ, বিন্দুমাধব (বেণীমাধব) ইত্যাদি। কাশীর দেবতা অসংখ্য, তাঁহাদিগের মাহাত্ম্যও অবর্ণনীয়। তাহার বর্ণনা করিতে গেলে শেষ হইবে না, পাঠক অবসর-মত 'কাশীখণ্ড' পাঠ করিয়া এ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন; অথবা সংক্ষেপে 'কাশী-পরিক্রমা'-খানিতেও এ কার্য্য হইতে পারে।

এই অসংখ্য দেবদেবীর প্রসঙ্গে একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। কাশীবাসীর বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণা-দর্শন তো নিত্যযাত্রার প্রধান অঙ্গ; কেদার-গৌরী, বীরেশ্বর-সঙ্কটা-দর্শনও বার-বিশেষে হয় পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দুর্গাবাড়ী যাওয়া, মা-দুর্গা ও জগজ্জননীর জননী

মা-মেনকার সাক্ষাৎকারলাভও তিথিবিশেষে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, বিশালাক্ষীদর্শন শত-কে একজনও করেন কিনা সন্দেহ; তাঁহার মন্দির কোথায়, তাহা পর্য্যন্ত অনেকে জানেন না। অথচ কাশী ৫১ পীঠের অন্যতম,—দেবী বিশালাক্ষী, শিব কালভৈরব। কালভৈরব কাশী কোতোয়ালের নকরী লইয়া বিশ্বেশ্বরের তাঁবেদারী করিয়া কোনও প্রকারে টিকিয়া আছেন; কিন্তু দেবী বিশালাক্ষীর মাহাত্ম্য 'প্রত্যক্ষ-মাহেশ্বরী কাশীপুরাধীশ্বরী' অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্যে একেবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। (একটু স্থূল রসিকতা করিয়া বলা যায়, পীঠের দেবতা পেটের দেবতার চাপে কোণঠেশা হইয়া আছেন।)

যাক্, আসল কথা হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। তবে দেবতাদের প্রসঙ্গে এরূপ অন্যমনস্ক হওয়া ক্ষন্তব্য। দেখা গেল, দিবসের প্রথম প্রহরটা 'কাশীবাসী'র দেবোদ্দেশে উৎসৃষ্ট। মনে এই প্রশ্ন উদয় হয়, প্রাতে এমনটি হয় কেন? জানি ইহাই শাস্ত্রের বিধি। অদ্ভুতানন্দ-স্বামী (লাটু মহারাজ) বলিয়াছেন, 'এ সময় প্রকৃতি অনুকূল থাকে, আর ত্বাড়াতাড়ি ইষ্টে মন বসে।' [১১] তাহাই বা কেন হয়? আমার মনে হয়, ইহার ভিতর একটি রহস্য আছে, যেজন্য প্রাতেই মানবের মনে এই দিব্য ভাবের উদ্ভব হয়। [১২] সে রহস্যটি এই—গভীর রাত্রে নিদ্রাবশে

---

(১১) শ্রীমদ্ অদ্ভুতানন্দ-শ্রীমুখ-নিঃসৃত সৎকথা ১ম ভাগ (স্বামী সিদ্ধানন্দ-কর্ত্তৃক সংগৃহীত) ৯৮ পৃঃ।

(১২) অবশ্য অনেক লোকেরই ওরূপ কিছু হয় না, ও সব বালাই নাই। প্রাতে উঠিয়াই অর্থচিন্তা, অন্নচিন্তা—আর আমার মত লোভী রোগীর "আজ কি কি তরকারী খাইব, কিসের ডাল হইবে, দাদখানি চাল ফুরাইয়াছে কি না, 'চিনিপাতা দৈ, ডিমভরা কৈ' বাজার হইতে আনিতে যেন ভুল না হয়," এবংবিধ চিন্তা! 'ভাবনা যাদৃশী যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।'

স্থূলদেহটা পৃথিবীতে পড়িয়া থাকে, আত্মা দেহ ছাড়িয়া ঊর্দ্ধগতি হইয়া আনন্দধামে আনন্দ আস্বাদন করিতে যায়, নিদ্রাভঙ্গে স্থূলদেহে ফিরিয়া আসে। (যেমন সন্তানের জাগরণের সাড়া পাইলেই জননী তাহার পার্শ্বে ছুটিয়া আসেন; অনেক সময়ে সন্তান টেরও পায় না যে জননী কাছছাড়া হইয়াছিলেন।) এই ব্রহ্মানন্দ-আস্বাদের অব্য-বহিত পরেও মানবের মন দিব্যভাবে পূর্ণ থাকে। তাহার পর, কয়েক দণ্ড ব্যাপিয়া দূরবর্ত্তী দেবালয়ে-দেবালয়ে ঘূরিতে ঘূরিতে দুর্ব্বল মানবদেহে জীবধর্ম্মবশতঃ ক্লান্তিশ্রান্তি ক্ষুধাতৃষ্ণা আসে। এবঞ্চ স্থূলধর্ম্মা পৃথিবীর ধূলি-পঙ্ক-আবর্জ্জনা ও দূষিত বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া মানবমনে আবার দেবভাবের পরিবর্ত্তে সাধারণ জীবভাব বলবৎ হয়। তাহার ফলে, ফিরিবার পথে যাত্রীরা রসদ-সংগ্রহ করিয়া গৃহে ফেরেন— তখন পেটের চিন্তাই বলবতী, 'অন্নচিন্তা চমৎকারা'। 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা'। আলু পটোল বেগুন কুমড়া হইতে আরম্ভ করিয়া খেড়ো ঢেঁড়স নিনুয়া কাঁকরোল ঝিঙে উচ্ছে করোলা কচু কাঁচালঙ্কা কচুর শাক ও ফুল (শুনিয়াছি সুখাদ্য), ডেঙো ডাঁটা, এমন কি কুঁদরু (তেলা-কুচার জ্ঞাতি, পটোলের অনুকল্প), পোয়াল-ছাতা পর্য্যন্ত পূজাজপে পবিত্রী-কৃত শ্রীহস্তে বিরাজ করেন, নামাবলির আঁচলে বাঁধা পড়েন, ফুলের সাজি-তেও চড়েন। অনেক বিধবা বিড়ালের জন্য মাছ পর্য্যন্ত কিনিয়া লইতে ভুলেন না! এই শ্রেণীর কাহারও কাহারও ব্যাপারীদের কাছ হইতে আনাজ চুরি করার অখ্যাতিও আছে। ধরা পড়াতে লাঞ্ছিত হইতেও দেখা গিয়াছে। দেবভাব হইতে সাধারণ জীবভাব, তাহা হইতে এই দানবভাব বা দস্যু-বৃত্তিতে অবতরণ আক্ষেপের বিষয় বটে, কিন্তু অনুষ্ঠানগত ধর্ম্মে এই গলদ ঘটিবার সম্ভাবনাই বেশী। ইহারা সত্য সত্যই দিব্যভাবভাবিত নহে, মনে করে শাস্ত্রবিহিত আচার-অনুষ্ঠান করিলেই দিনগত পাপক্ষয় হইবে, কেহ

কেহ বা শুধু লোক-দেখান ভড়ং করে, ঠাট বজায় রাখে। তাই বেশ্যাদের গঙ্গাস্নানের ন্যায় ইহারা 'যাত্রা' করিয়াই মনকে চোখ ঠারে,—পাপক্ষালন হইল, দেহ-মন শুদ্ধ হইল; বুঝে না যে এ 'হস্তিস্নান' বই আর কিছুই নহে। পরমুহূর্ত্তেই যে ধূলাকাদা সেই ধূলাকাদাতেই সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া যায়। সেদিন শুনিলাম জনৈকা কাশীবাসিনী ব্যভিচারিণী প্রবীণা বিধবা 'কেদার-বদরী' করিয়া কাশীধামে ফিরিয়াছেন—পুনর্মূষিক (পুনর্দূষিকা?) হইবার জন্য!

যাক্, মানবচরিত্রের এই কদর্য্য দিক্‌টা দেখাইবার প্রয়োজন নাই। Idealistic দিক্‌টাই দেখাইতে প্রবৃত্তি হয়, আনন্দ হয়। আবার সেই দিক্‌ই প্রদর্শন করি। যাত্রান্তে বাজার করিয়া ফিরিয়া 'যাত্রী' নামাবলি জপের মালা সাজি কমণ্ডলু ঘরের কোণে একধারে ফেলিয়া রাখেন, অথবা আলনায় বা হুকে বা শিকেয় তুলিয়া রাখেন। তাহার পর অল্পক্ষণ বিশ্রামান্তে পাদপ্রক্ষালনের পর রন্ধন, দেবতাকে নিবেদন (তখনও দেবভাব একপাদ অবশিষ্ট), পরে ভোজন—'আহার কর, মনে কর, আহুতি দাও শ্যামা মা রে।' 'যৎ করোমি জগত্যর্থং তদস্তু তব পূজনম্'। 'নারায়ণায়ৈব সমর্পয়ামি।' 'বিষ্ণুস্তৃপ্যতাম্।' আহারান্তে মুখশুদ্ধি, পরে দু'দণ্ড গড়ান; আহারের পর একটু আবল্য আসে, সুতরাং তন্দ্রাবেশ। ('মা দিবা স্বাপ্সীঃ', 'দিবাস্বপ্নং ন কুর্ব্বীত', 'আয়ুঃক্ষীণা দিবানিদ্রা' ইত্যাদি নিষেধবাক্য অল্পলোকেই জানেন বা মানেন।) তন্দ্রার ঘোরে আবার আত্মার স্থূলদেহত্যাগ ও আকাশমার্গে আনন্দধামে বিচরণ ও আনন্দ-আস্বাদন। ফলে তন্দ্রাভঙ্গে দেবভাবের জয়; তাহার প্রভাবে অপরাহ্নে 'কাশীবাসী'র কথকতা-কীর্ত্তন [১৩] পুরাণপাঠ প্রভৃতি-শ্রবণের জন্য

---

(১৩) কথকতা-কীর্ত্তনের আঙ্গিনাতেও স্ত্রীজাতির ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি কথা-কাটাকাটি। বিখ্যাত কথক ও কীর্ত্তনিয়া শ্রীযুক্ত রামকমল ভট্টাচার্য্যের মিষ্ট মিষ্ট ভৎ'সনাতেও তাঁহাদিগের চৈতন্য হয় না। অনেকে আবার কথা শুনিতে শুনিতে 'টেকো'

হরিসভা, জয়মিত্রের বা কুচবিহারের কালীবাড়ী, রাঙ্গামেটের সত্র প্রভৃতি স্থানে গমন এবং প্রদোষকালে দেবদর্শন গঙ্গাদর্শন-স্পর্শন ও গঙ্গাতীরে সন্ধ্যাহ্নিক জপাদি আচার-নিয়ম-পালন। আবার শ্রান্তি ক্লান্তি, ক্ষুৎ-পিপাসা, জীবধর্ম্ম বলবৎ, বৈকালিক ফলমূল 'মালাই' মিষ্টান্ন কিনিয়া গৃহে প্রত্যাগমন। ('মালাই' এখানে সকলের রাত্রের আহারে চাইই। ইহাতেই, রসময়ের দেহসজ্জায় চূড়ার উপর ময়ূরপাখার ন্যায়, রসলোলুপ রসনার 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'।) আবার পরদিন প্রাতঃকাল হইতে 'যাত্রা'দির পালার পুনরাবৃত্তি—যতদিন না শিব 'তারকব্রহ্ম' নাম শুনাইয়া কাশীবাসী জীবকে মুক্তি দেন।

জানি না, আমার উর্ব্বর-মস্তিষ্ক-প্রসূত এই রহস্যোদ্ভেদ রোগজনিত খেয়াল কি প্রকৃত তথ্য? যাহা হউক, ভাল কথার মিছাও ভাল, খোসখবরের ঝুটাও মিঠা। রামপ্রসাদ বলিয়া গিয়াছেন, 'আছে ভাল মন্দ দু'টা কথা, যা' ভাল তা' করাই ভাল।' তেমনি 'যা' ভাল তা' বলাই ভাল। 'সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ।' এই মীমাংসা মানিয়া লইতে ক্ষতি কি? জানি, কাশীধামে তথা মানবমনে সু কু দুইই আছে, জগতে কিছুই ষোল আনা খাঁটি নহে (ষোলকড়াই কাণা না হইলেই যথেষ্ট), শুধু খোদার উপর খোদকারিতে সেকরার হাতে পড়িয়াই যে সোণায় খাদ থাকে তাহা নহে, খনিতেও খাঁটি সোণা মিলে না, রসায়নবিদ্‌গণ বলেন। এ অবস্থায় ষোল আনা ভাল আশা করা যায় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানবপ্রকৃতির Idealistic দিক্ দেখিয়া ও দেখাইয়াই আমাদের আনন্দ হয়, খুঁজিয়া খুঁটাইয়া

চালান। 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।' তাই তো কোন্ বুড়ী পুরীর শ্রীমন্দিরে গিয়া পুরুষোত্তমের শ্রীমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে পুঁইমাচা দেখিয়াছিল। ইতি উৎকলখণ্ডের উপ-সংহারে বিট্‌কেল কাণ্ড!

খোঁচাইয়া কেঁচো খুঁড়িতে সাপ খুঁড়িয়া realistic দিক্ উদ্ঘাটিত করিয়া, কালী মাখিয়া কালী ঘাঁটিয়া কালী ছড়াইয়া কি লাভ, কি সুখ, কি ফল? 'ততঃ কিম্?' [১৪]

একে তো' দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করিয়া পাঠককেও ছাত্র-ভ্রমে শিক্ষা দেওয়ার লোভ সামলাইতে পারি না; তাহার উপর স্বাস্থ্য-ভঙ্গের জন্য গ্রীষ্মের ছুটি ফুরাইলেও বেকার বসিয়া আছি, অধ্যাপনা-প্রবৃত্তি প্রবল, অথচ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার মত শক্তি নাই (যাহাকে ইংরেজীতে বলে 'The spirit is willing but the flesh is frail'); এ অবস্থায় লেক্‌চার্ ঝাড়ার ঝোঁক রোখে কে? যাক্, আবার আসল কথায় ফিরিয়া আসিয়া এই দীর্ঘ নীরস প্রবন্ধ শেষ করি।

বাস্তবিক, এই সোণার কাশী, এই আনন্দ-কানন, এই স্বর্গভূমি, শেষ রাত্রির মঙ্গল-আরতি হইতে আরম্ভ করিয়া পরদিন রাত্রির প্রথম প্রহরান্তে শয়ন-আরতি পর্য্যন্ত দিব্যভাবে ভরপূর, আনন্দে ওতপ্রোত। 'কাশীবাসী'র কায়মনের সুরও ইহার সহিত তানলয়বদ্ধ। মঙ্গল-আরতির মধুর নহবত-বাদ্যে এই সুরটুকু কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশে, প্রাণ স্পর্শ করে, শয়ন-আরতির বাদ্যোদ্যম পর্য্যন্ত আনন্দে আনন্দে বিহার করিতে করিতে মনে-প্রাণে 'আনন্দ আর ধরে না রে!' তাহার পর সুষুপ্তি। (এই অভাগা লেখকের মত রোগীর জন্য নহে। 'O Sleep, O gentle

---

(১৪) একজন রসিক ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি, কাশী প্রথম বেলায় অর্থাৎ প্রাতে কৈলাস—সকলের মুখেই 'হর হর বম্‌বম্' বোল; দ্বিতীয় বেলায় অর্থাৎ মধ্যাহ্নে জগন্নাথ-ক্ষেত্র—ব্রাহ্মণ পত্নীভাবে পরিচিতা নাপিতানী ধোপানী মুচিনীর হাতে খাইতেছেন; তৃতীয় বেলায় অর্থাৎ অপরাহ্নে নৈমিষারণ্য—সকলে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিতেছেন; চতুর্থ বেলা অর্থাৎ রাত্রির অন্ধকারে ('Tis only daylight that makes sin') শ্রীবৃন্দাবন অর্থাৎ কেলিবিলাস। Realism এর চূড়ান্ত বটে।

sleep, Nature's soft nurse, how have I frighted thee !")
[এই ! আবার পঠিত ও পাঠিত বিদ্যার চর্ব্বিতচর্ব্বণ !] অবশ্য যাহারা ধর্ম্মপ্রাণ, মোক্ষকাম, তাহাদেরই প্রাণে এই ঢং ঢং ঘণ্টাধ্বনি, ডিমি ডিমি ডমরুবাদ্য, নানা যন্ত্রের অপূর্ব্ব সঙ্গত, শান্তিধারা সেচন করে, কর্ণে মধুবর্ষণ করে। অপরের কর্ণে ইহা পশে না, পশিলেও প্রাণ তাহাতে বসে না, রসে না, খসিয়া ধ্বসিয়া পড়ে। এই সব বহিরঙ্গ ব্যক্তিদের বহিঃকর্ণে বাজে—রাত্রে রাসভ-রাগিণী অর্থাৎ গাধার চীৎকার (যেমন দূরের গঙ্গা নিকট হয়, তেমনি এক্ষেত্রে ৺শীতলা মাতার প্রসাদে এবং রজকের কল্যাণে ব্যাসকাশীও শিব-কাশীর কাছাকাছি হইয়াছে !) এবং কুকুর-কীর্ত্তন (কুকুর যে বটুকভৈরবের বাহন !)—আর দিনমানে, ভোর না হইতে মাখনওয়ালীর মধুর মোলায়েম প্রভাতী, বেলা হইলে ফেরিওয়ালার নানা স্বরের গিটকিরি, বেনারসীবোনা তাঁতের খটখটি, [১৫] অপরাহ্নে ডাকপিয়নের জোর-গলায় 'চিঠ্‌ঠি'র ডাক, খবরের কাগজওয়ালার তারস্বরে 'ডেলি নূজ্‌' 'অমৃৎ বাজার' চীৎকার, আর সারাদিন, কখনও কখনও সারারাত ধরিয়া বানরের কিচকিচি ও ইতরশ্রেণীর হিন্দুস্থানী নারীদিগের কলহ-কাজিয়া। যাক্‌, বিস্তর বাজে বকিলাম। কবির কথা মনে পড়িয়া গেল—'সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।' অতএব এক্ষণে এইখানে বেদব্যাসের বিশ্রাম।

---

(১৫) লেখক মদনপুরা মহল্লায় ছিলেন, এই মহল্লা জোলাদিগের প্রধান কেল্লা, দুই চারি ঘর হিন্দু এখানে থাকেন। জ্বরের যন্ত্রণায় অস্থির রোগীর কর্ণে এই খটখটি যে 'কর্ণেষু বমন্তি মধুধারাম্‌' কিরূপ, তাহা আর প্রকাশ করিয়া বলিতে চাহি না। স্ত্রী-কন্যার জন্য বেনারসী শাড়ী ও (blouse-piece) ব্লাউস্‌-পিস্‌ কেনার সাধে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে।

[আজ সেই স্নেহের কন্যা সকল সাধে বাদ সাধিয়া সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছে। আর হতভাগ্য আমি এই শোকের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে বাঁচিয়া আছি।—পুস্তকাকারে প্রকাশ-কালের মন্তব্য।]

রোগশয্যার খেয়াল

(১ম কিস্তি)

(পূজার তত্ত্ব)

('মাসিক বসুমতী,' আশ্বিন ১৩৩০)

"Expect no healthy conclusions from me this month, reader; I can offer you only sick men's dreams." LAMB : '*The Convalescent*' in the *Last Essays of Elia.*

জন্মখণ্ড

বিষয়কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া যখনই কাশীবাসের অবকাশ পাইয়াছি—পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবশে এই অধমের সে সৌভাগ্যলাভ বহুবার হইয়াছে—তখনই ৺বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণার কৃপায় স্বাস্থ্যের উন্নতি, মনের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। এমন কি, কৃতবিদ্য কৃতী সদ্যোবিবাহিত যুবক জ্যেষ্ঠপুত্রের অকালমৃত্যু-জনিত নিদারুণ শোকে এই 'আনন্দকাননে' আসিয়া সান্ত্বনা ও শান্তি পাইয়াছি। কিন্তু এবার প্রায় বৎসরাবধি রোগভোগে ভগ্নস্বাস্থ্য ও (বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সদ্যঃ যশোভাগী) অষ্টাদশবর্ষীয় কনিষ্ঠ পুত্রের অকালমৃত্যুজনিত মহাশোকে ভগ্নহৃদয় হইয়া, কাশী ও কাশীশ্বরের শরণ লইয়া শান্তির পরিবর্ত্তে উৎকট অশান্তি ভোগ করিয়াছি; এবং তাহাও অল্পদিনের জন্য নহে—দীর্ঘ চাতুর্ম্মাস্য রোগভোগ। তবে লাভের মধ্যে এইটুকু যে, দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, রোগশয্যায় পড়িয়া থাকিলেও রোগযন্ত্রণার মধ্যে কল্পনার লীলার বিরাম ছিল না; বরং একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা বা উন্মাদনা-বশে বন্যাস্রোতের ন্যায় নব নব ভাবোচ্ছ্বাস হৃদয়সমুদ্রে ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিত। (কবির ভাষায় বলিতে গেলে, 'শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস, কলাপের মত করেছে

বিকাশ।') সামলানই দায় হইত। সেই সব নব নব ভাবের অধিকাংশই তখনই তখনই সংগ্রহের অভাবে উপিয়া গিয়াছে, মহাশূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে; নরলোকে সেগুলির প্রচার হইল না। (অবশ্য দেবলোকে প্রচার হইবার আটক নাই, যেহেতু, 'ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ।') নবনির্দ্ধারিত লবণ-কর লইয়া একটা নাতিদীর্ঘ বিদ্রূপাত্মক (satirical) প্রবন্ধ, হোমিওপ্যাথি লইয়া তিনটি দৃশ্যে সমাপ্ত একখানি ক্ষুদ্র ব্যঙ্গ-নাটিকা (লেখকের প্রথমে হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসা হয়, তাহাতে ফলোদয় না হওয়াতেই নাটিকার উৎপত্তি), এক টুকরা গবেষণা (কি বিষয়-অবলম্বনে, তাহা পর্য্যন্ত বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছি)—এইগুলি চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছে। অথচ এইগুলি লেখকের প্রকাশিত রচনাবলি অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট ছিল না। (Methinks I hear the Cynic say) বিশ্বনিন্দুক অবশ্য টিপ্পনী কাটিবেন, 'যে মাছটা পালায় সেইটাই বড় হয়।' যাহা হউক, দুই একটি প্রবন্ধ ও কয়েকটি 'খেয়াল' স্মৃতিসাগর মন্থন করিয়া উদ্ধার (rescue) করিতে পারিয়াছি; একটু সুস্থ হইয়াই খসড়া-আকারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম; অদ্য পূজার বাজারে "খেয়াল" কয়টি 'মাসিক বসুমতী'র পাঠকবর্গকে নবরত্ন-উপঢৌকন (!) দিতেছি। বোধ হয়, সব কয়টিতেই রোগশয্যার গন্ধ পাওয়া যাইবে।

"জানি না এর কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা নয়।
জানি না কে কোন্‌টা রাখে, কোন্‌টা লয়॥"

ইংলণ্ডের খ্যাতনামা কবি কোল্‌রিজ্ (Coleridge) স্বপ্নে কবিতা রচনা করিয়া তাহা জাগ্রদবস্থায় অসম্পূর্ণ আকারে ('Kubla Khan') লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; স্কট্‌ল্যাণ্ডের খ্যাতনামা লেখক ষ্টিভ্‌ন্‌সন্ (R. L. Stevenson) তাঁহার একখানি প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকার ('The strange case of Dr. Jekyll & Mr. Hyde') মূল

কথাটি স্বপ্নে পাইয়াছিলেন। (স্বপ্নাপ্ত ঔষধের চেয়েও তাজ্জব ব্যাপার!) বাঙ্গালা সাহিত্যেও দেখা যায়, একাধিক কবি স্বপ্নে দেবদেবীর প্রত্যাদেশ পাইয়া কাব্য লিখিয়াছেন। আর অভাগা আমার ভাগ্যে জ্বরের ঘোরে ফলিয়াছে—এই খেয়ালগুলি। 'মৌক্তিকং ন গজে গজে।' ইতি জন্মখণ্ডঃ সমাপ্তঃ।

১। কাশীতে নববর্ষা

[জ্যৈষ্ঠের, জ্বরের, ফোড়ার, যথা—(?) পরিমাণ কুইনিনের, এবং পশ্চিম-মুখো ঘরের—এই পাঁচ রকমের গরমে পঞ্চতপাঃ হইয়া যখন 'ত্রাহি ত্রাহি' করিতে করিতে চাতকের মত শুষ্ককণ্ঠে 'ফটিকজলে'র যাচক, তখন সন্তোবিপত্নীক 'অলকা'-সম্পাদক (হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ) দেখা করিতে আসিলে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম, "এখানে বর্ষা আরম্ভ হয় কোন্ সময়ে বলিতে পারেন?" তিনি বলিলেন, "১লা আষাঢ়।" একেবারে আস্ত 'মেঘদূত!' আর তাঁহার অবস্থা কালিদাসের যক্ষ অপেক্ষাও শোচনীয়। (যাক্ সে দুঃখের কথা।) তাঁহার এই ব্রহ্মবাক্য যথাসময়ে ফলিয়াছিল।] কাশীতে ঠিক 'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে' 'বর্ষা এলায়েছে তা'র মেঘময় বেণী।' তবে এ অঞ্চলের মহিলাকুলের চুলের গোছ বঙ্গাঙ্গনাগণের কেশকলাপের মত ঘন ও দীর্ঘ হয় না, তাই হেথায় বর্ষা-যোষার বেণী হইতে জল ঝর্ঝর্ করিয়া ঝরিতেছে না, ঝির ঝির করিয়া পড়িতেছে। মুষলধারে অর্থাৎ ঝম্-ঝম্ করিয়া হইতেছে না, সূচিধারে অর্থাৎ ফিস্ ফিস্ করিয়া হইতেছে।[১]

---

(১) শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়াই কথাটা লিখিয়া ফেলিয়াছি ও খোট্টাসুন্দরীদের খাটো চুল লইয়া খোটা দিয়াছি। পিছে মালুম-হো গিয়া—শ্রাবণের বৃষ্টিবারিধারার কি প্রবল তোড়! শিলং চেরাপুঞ্জি কোথায় লাগে? ইহাকে মুষলধারে বলিলেও কম

যাহা হউক, ইহাতেই এবারকার জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পর বসুমতী ঠাণ্ডা হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও দুই ডিগ্রী নামিয়া গেল। এই জ্বরতপ্ত কুইনিন্-জব্দ রোগীর দগ্ধপ্রাণে আষাঢ়ের আসার-ধারার আসার সঙ্গে সঙ্গে আশার সঞ্চার হইল। 'কাশীতলবাহিনী' গঙ্গা কাশীর পাষাণময়ী পুরী শীতল করিতে পারেন নাই; দু'ফোঁটা আকাশের জল তাহা করিল। এ যে স্বরগের ধারা, আর সুরধুনী স্বর্গ হইতে মর্ত্তের মাটীতে পড়িয়াই মাটী হইয়াছেন। (সত্যই তো তিনি আমাদের মা-টি, 'মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ।')

২। মা-সরস্বতীর শাপ

জ্ঞানোদয় হইতে একনিষ্ঠ হইয়া মা-সরস্বতীর সাধনা করিয়াছি, অন্য দেবদেবীর ধার ধারিতাম না, শুধু ঠাকুরদেখা-হিসাবে তাঁহাদিগকে ভক্তি করিয়াছি। মা- সরস্বতীও একনিষ্ঠ সাধনায় প্রসন্না হইয়া এই অধমকে দুইটি বর দিয়াছিলেন, (/০) অধ্যাপনা-প্রিয়তা, (৵০) রচনা-শক্তি। ইহা হইতেই আমার যা' কিছু ধনমান যশোভাগ্য। (বেশ একটু অহমিকা প্রকাশ করিলাম; কিন্তু ভবের হাট হইতে দোকানপাট তুলিতে বসিয়াছি, এখন ইহার জন্য বোধ হয় ক্ষমার্হ বিবেচিত হইব।) পুনঃ পুনঃ উপযুক্ত পুত্রের অকাল-বিয়োগজনিত শোকে পঠন-পাঠনে, রচনায় ও ছাত্র-মণ্ডলীর সমক্ষে বক্তৃতায় বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল, আজীবন-সঞ্চিত রাজ-

---

করিয়া বলা হয়; একেবারে উদুখলধারে, অথবা গুরুচাণ্ডালী ভাষায়, ঢেঁকিধারে। ইংরেজীতে বলিতে হইলে, 'It rains cats and dogs' নহে, 'It rains bulls and buffaloes'। আর মা গঙ্গাও খুব শোধ তুলিলেন—জলে সদর রাস্তা গলিরাস্তা পাথার—'ইন্দ্রদমন, 'পুষ্কর', 'কুরুক্ষেত্র' কিছুই এবার বাকী রহিল না। (এগুলি কাশীর গঙ্গার জলবৃদ্ধির ব্যাপার, ঠিক কি শাস্ত্রোক্ত বস্তু, জানি না।)

ভাষায় রচিত গ্রন্থরাজি গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন দিতে, বা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত 'চন্দ্রশেখরে'র মত অগ্নিতে আহুতি দিতে ঝোঁক হইত। ইহাতেই তো মা-সরস্বতী বেশ একটু রুষ্ট হইয়াছিলেন। তাহার উপর আবার মায়ের পার্থিব পীঠস্থান (কাগজ) পীড়াকালে শুধু দু'পা দিয়া মাড়াইয়াই ক্ষান্ত হই নাই, তদপেক্ষাও কদর্য্য কার্য্যে লাগাইয়াছি।[২] তাই মা অধিকতর কুপিত হইয়া দক্ষিণ করতলে (Carbuncle) কার্ব্বঙ্ক্লের উদ্ভব করিয়া দিয়া হাতটি আড়ষ্ট করিলেন, 'বাহু-প্রতিষ্টম্ভেন' 'বিবৃদ্ধমন্যু' প্রকাশ করিলেন, ফলে রচনাশক্তি রহিত হইল। মায়ের শাপ হইতে কোন্ দেবতা রক্ষা করিতে পারেন ?

এই মন্তব্য খসড়া-অবস্থায় দেখিয়া আমার জনৈক আত্মীয় আমাকে বুঝাইয়াছিলেন, "এটা আপনার বিষম ভুল ; 'কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কদাপি নয়।' ছেলে বেসামাল হইয়া যদি মায়ের কোল নোংরা করিয়া দেয়, তাহাতে কি মা রাগ করেন ? রাগ করিয়া তিনি কি শাপ-মন্যি দিতে পারেন ? 'ন মাতা শপতে পুত্রম্।' আর মায়ের শাপ তো ছেলের লাগে না।"

এখন দেখিতেছি, আত্মীয়বর আমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য স্তোক-বাক্য প্রয়োগ করেন নাই, কথাগুলি খাঁটি সত্য। কার্ব্বঙ্ক্ল্ সারিলে প্রথমেই লেখন-কুশলতা ফিরাইয়া পাইয়াছি ; তখনও দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মুখে অন্নগ্রাস তুলিতে পারি না, অথচ লেখনী-চালনায় হস্ত বেশ তৎপর হইয়াছিল। ধন্য মায়ের অবিকারী স্নেহ, ধন্য তাঁহার অহৈতুকী কৃপা !

পুনশ্চ।—কার্ব্বঙ্ক্লের ক্ষত ও বেদনা সারিয়াছে, কিন্তু হাত আড়ষ্টই আছে, তা' আবার ডা'ন হাত। সুতরাং পদে পদে পরাধীন হইয়া

---

(২) একটু বীভৎস-রসের সঞ্চার করিলাম। রোগের ক্ষেত্রে কার্য্যটা অপরিহার্য্য ; সুতরাং সাহিত্যক্ষেত্রেও একটু গড়াইয়া পড়িলে উপায় কি ?

পড়িয়াছি। এমন কি, 'দক্ষিণ-হস্তের ব্যাপারে'র জন্যও (মুখে অন্নের গ্রাস তুলিবার জন্য, ভাত মাখিবার জন্য) পরের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। (অবশ্য সাহায্যকারিণী ঠিক 'পর' নহেন।) জ্যোতিষীর প্রমুখাৎ শুনিয়াছি, এই যে বৎসরাধিককাল রোগে ভুগিতেছি, ইহা গ্রহনিগ্রহ। আচ্ছা, এই পরাধীনতা কোন্ গ্রহের প্রকোপে? তিনিই বুঝি ভারতেরও ভাগ্য-বিধাতা?

পুনঃ পুনশ্চ।—জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসায় জানিলাম, ঘা, ফোড়া ইত্যাদি 'মঙ্গলে'র প্রকোপে ঘটে। আশ্চর্য্য বটে, 'মঙ্গল' অমঙ্গল ঘটান! যাহার যেমন অদৃষ্ট! আজন্মদুঃখিনী সীতাদেবীর ভাগ্যে 'অশোকের বন' 'শোকের ভবন' হইয়াছিল। আর বাল্যে মাতৃহারা, যৌবনকাল হইতে এই অকাল-বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ পুত্রহারা, হতভাগ্য আমার অদৃষ্টে 'মঙ্গল' অমঙ্গল বিধান করিতেছেন, 'আনন্দ-কাননে' আসিয়াও নিরানন্দ নিবারণ হইতেছে না, প্রত্যুত কায়িক ও মানসিক যন্ত্রণা 'দিনে দিনে পরিবর্দ্ধমানা' হইতেছে। কবি বড় দুঃখেই বলিয়াছেন—'বিষমপ্যমৃতং কচিদ্ভবেদমৃতং বা বিষমীশ্বরেচ্ছয়া।' 'যদ্বিধের্মনসি স্থিতম্' বলিয়াই বুক বাঁধিতে হইবে।

৩। ক্ষৌরকর্ম্ম ও নির্ব্বেদ

[দীর্ঘকাল রোগভোগের পর আরোগ্যস্নানের দিন ক্ষৌরকার্য্যের সময় মনে এই খেয়ালটির উদয় হইয়াছিল।]

পহেলা দশা। প্রথম প্রথম যৌবনারম্ভে যখন ঠোঁটের উপর অল্প অল্প গোঁফ ওঠে, যেন ইট-পাথরের আশে পাশে ভিজা জমিতে দূর্ব্বাঘাস গজায়—'বদনমণ্ডল, চাঁদ নিরমল, ঈষৎ গোঁফের রেখা'—তখন সেই গোঁফের তোয়াজ দেখে কে? 'সাহেবদের' গৃহপ্রাঙ্গণস্থ (Lawn) 'লনে' 'সমানি সমশীর্ষাণি ঘনানি' নবদূর্ব্বাদল জন্মাইবার জন্য মালীর যত্নও ইহার

কাছে হারি মানে। 'দণ্ডে শতবার' আয়না ধরিয়া দেখা, সেই কোমল, মসৃণ, রোমরাজির ('soft down of youth') উপর সাদরে আঙ্গুল বুলান (যেন নবীনা জননী ক্রোড়স্থ শিশুর অঙ্গে সস্নেহে হাত বুলাইয়া অনির্ব্বচনীয় স্পর্শসুখ অনুভব করিতেছেন); আর কিরূপে নিবিড়কৃষ্ণ 'ভ্রমরপাঁতির দেখা' অগৌণে মিলিবে, 'সেই ভাবনা রাত্রিদিনে।' অশৌচান্তে কামাইতে হইলে মাথায় বজ্রাঘাত হয়, বলিতে চাহে—'শির দেঙ্গে, মোচ নেহি দেঙ্গে।' বার বার কামাইলে শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে, ঘন (কিন্তু কর্কশ!) হয় বলিয়া আশ্বাস দিলেও মন মানে না, দু'দিনেরও বিরহ সহ্য হয় না। (স্ত্রৈণ পুরুষের প্রাণেশ্বরীকে প্রসবের জন্য পিত্রালয়ে প্রেরণের ন্যায়।) [৩]

দোসরা দশা। পরে যৌবন ভাটাইয়া আসিলে নির্ব্বেদের সঞ্চার আরম্ভ হয়, মুসলমান-খৃষ্টানের চিহ্ন জবরজঙ্গ জঙ্গলী দাড়ী কামাইয়া ফেলা হয়। (দাড়ী-চশমা ব্রাহ্মের লক্ষণ, এরূপ একটা ধারণাও এক সময়ে ছিল।) দাড়ী ফেলায় চেহারাটা বেশ ছিমছাম, ভদ্র, সভ্য দেখায়। [৪]

---

(৩) গোঁফ-সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, দাড়ী-সম্বন্ধেও কতকটা সেই কথা বলা চলে। অবশ্য আমাদের যৌবনকালের কথা বলিতেছি, হালের ছোক্‌রা-বাবুদের কথা বলিতেছি না। তাঁহাদের ধুতী, চুড়ীদার, লপেটা, মাথার চুলে সিঁথি কাটা, রিষ্ট্-ওয়াচ্, সবই মেয়েলি ঢংএ (effeminate); তাহারই সঙ্গে মিল রাখিয়া স্বহস্তে 'নিরাপদ' ক্ষুর (safety razor) চালাইয়া তাঁহারা মুখমণ্ডলের সর্ব্বত্র সমূলে কেশকুল ধ্বংস করিয়া (Kroppএর ক্ষুরে crop up করিয়া), যাত্রার দলের সখী সাজেন, (কি ভাগ্যে ভ্রূ কামান না!) কেবল মাথার সাম্‌নে এক থকা ঝাঁকড়া চুল রাখেন (ইংরেজী 'Time's forelock'এর নজিরে?), ইহাই হইল হাল ফ্যাশান্। (ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মস্তকের মধ্যস্থলে স্থূলশিখা রাখারই যত অপরাধ!) সম্মুখ দেখিলে নিউফাউণ্ড্‌ল্যাণ্ড্ দেশের জীববিশেষের সহিত সাদৃশ্যই চোখে ঠেকে। (তবে প্রৌঢ়দের, বিশেষতঃ 'চতুর্থে' চতুর্থপক্ষাশ্রয়ীদের বলি, এরূপ চাঁচিয়া পুঁচিয়া কামানর একটা মস্ত সুবিধা—৭৪ বৎসরেও ১৪ বৎসরের অজাতশ্মশ্রু বালক সাজা যায়।)

(৪) ঐতিহাসিকের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে এই কারণে রুষজাতির সভ্যতা-বিধানের মূলপুরুষ পিটার্ দি গ্রেট্ দাড়ীর উপর ট্যাক্স বসাইয়াছিলেন এবং জোর করিয়া সকলকে

তেসরা দশা। প্রৌঢ় বয়সে, পাকা প্রবীণ হইলে, গোঁফের মায়াও কাটিয়া যায়, ক্রমে নির্ব্বেদ ঘনীভূত হয়।[৫] তখন গোঁফ ফেলার ধুম পড়ে। (শত্রুপক্ষ বলেন, নির্ব্বেদ-ফির্ব্বেদ ও-সব বাজে কথা। মাথার চুলের আগে গোঁফ পাকিতে সুরু করে, গোঁফ গোয়েন্দাগিরি করিয়া বয়স ধরাইয়া দেয়, তাই গৃহশত্রু বিভীষণ গোঁফের ধ্বংস।)

চৌঠা দশা। দাড়ী গেল, গোঁফ গেল, বাকী রহিল মাথার চুল। এ দিকে বার্দ্ধক্যও আসিল; এখন 'চতুর্থে কিং করিষ্যতি', দেখা যাউক। কিন্তু এ যে ঝুনো, আর নির্ব্বেদের দাঁত ফুটে না, 'সে বড় কঠিন ঠাঁই।' জরায় জরায় জরিয়া শিরোদেশ বিরলকেশ হইয়া পড়ে, মাথাময় টাকে ঢাকে, তথাপি সেই পাতলা দু'চার গাছ চুলের মায়া যায় না। সেই কয়গাছিই যেন গ্রীক্-পুরাণোক্ত দেবীর হস্তধৃত জীবনসূত্র ('thread of life'), অথবা য়িহুদি বীর (Samson) স্যাম্‌সনের ঝাঁকড়া চুলের মত পৌরুষের আধার। হায় রে মায়া! তখনও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বা

দাড়ী কামাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। সকল নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে (Every rule has its exception); কাহারও কাহারও মুখে দাড়ী দিব্যি মানায়। ইহার দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া দাড়ীর তরফে ওকালতী করিবার একটা প্রবল ঝোঁক হইতেছে, কিন্তু ঝোঁকটা কষ্টেস্বষ্টে দমন করিলাম। কেননা, তাহাতে দীর্ঘ দীর্ঘ দাড়ীর ভারে ফুট্‌নোট্ বেজায় ভারী হইবে; ছোট্ট প্যারার পিছনে প্রকাণ্ড পাদটীকা নিতান্তই বেমানান হইবে—সেই আরব্যোপন্যাসে বর্ণিত (পরীবানুর ভ্রাতা) দেড় ফুট্ খাড়াই লোকটির ত্রিশ ফুট্ লম্বা দাড়ীর মতই দেখাইবে। আর পাদটীকায় সম্মানাস্পদ ব্যক্তি-দিগকে স্থান দেওয়া শিষ্টাচার-সম্মত নহে। অতএব দোসরা দশার নজিরে দাড়ী বর্জ্জন করিলাম। তবে বারান্তরে সবিস্তরে দাড়ীমাহাত্ম্য বর্ণনা করিব, 'জানান' দিয়া রাখিলাম। দাড়ীধারী সম্পাদক ও পাঠক আশ্বস্ত হউন।

(৫) যুবাদের বেলায় গোঁফ ফেলাও যদি কেহ নির্ব্বেদের লক্ষণ বলিয়া বসেন এবং "পূর্ব্বে বয়সি যঃ শান্তঃ স শান্ত ইতি মে মতিঃ। ধাতুষু ক্ষীয়মাণেষু শমঃ কস্য ন জায়তে॥" এই শ্লোক ঝাড়িয়া বাহবা দেন, তবে নাচার।

বৌদ্ধশ্রমণের মত মস্তক মুণ্ডন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ফল কথা, বাঙ্গালী হিন্দুর নির্ব্বেদ মুখেই (দাড়ী গোঁফে) থাকিয়া যায়, মাথায় কখনও উঠে না, শিরোধার্য্য হয় না। এমন কি, কেহ কেহ মহাগুরুনিপাতেও মস্তক মুণ্ডন না করিয়া পুরোহিতকে যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য ধরিয়া দিয়া প্রতিনিধিতে সারেন। (নিষ্ঠাবান্ হিন্দু বলিয়া প্রতিপন্ন উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারীকে এরূপ করিতে দেখিয়াছি।) ইঁহারা, বোধ হয়, ভয় করেন, মাথা মুড়াইলে লোকে ঘোল ঢালিয়া দিবে বা গোচোর ঠাওরাইবে!

৪। দশ আনা ছয় আনা

[এ কালের ছোকরাবাবুদের চুলছাঁটার কথা বলিতেছি না, তাহার মুড়া তো আগেভাগেই মারিয়া রাখিয়াছি—৩নং ফুট্‌নোট্ দেখুন। জমিদারীর সরিকানা স্বত্বের কথাও বলিতেছি না। নিজের দেহতত্ত্ব, রোগভোগের কথা লইয়াই আছি।]

এক দিন জনৈক দূরপ্রবাসী বন্ধুর পত্র পাইলাম, তিনি লিখিয়াছেন, 'আপনার পত্র পড়িয়া বুঝিতেছি, দশ আনা রকম সারিয়াছেন।' বন্ধুটি দেখিলাম, দূরবাসী হইয়া দূরদর্শীও সাজিতে চাহেন, নতুবা রোগীকে না দেখিয়া, শুধু রোকায় সংবাদ জানিয়া, অত দূর হইতে কিরূপে—কোন্ শুভঙ্করী প্রণালীতে—আমার আরোগ্য-কষা আয়ত্ত করিলেন এবং এরূপ শব্দভেদী বাণ ঝাড়িলেন? যাহা হউক, বন্ধুবর শেষটা অদূরদর্শী বা অপরিণামদর্শীই প্রমাণিত হইলেন। কেননা, যখন তাঁহার পত্র পাইলাম, তখন বার বার তিনবার পড়িয়াছি। আমি উত্তরে লিখিলাম, "আপনার অঙ্কটা হয় তো মূলে ঠিক কষা হইয়াছে, কিন্তু জানেন তো, দশ আনা (৷৷৵০) ছয় আনা (৷৵০) হইতে বেশীক্ষণ লাগে না—একটা চোখের ওয়াস্তা!" এক জন তথাকথিত শুভানুধ্যায়ীর সহিত সে দিন বহুকাল

পরে দেখা হওয়াতে তিনি ঝাঁ করিয়া বলিয়া বসিলেন, 'আপনার চেহারা দেখিয়া বেশ সারিয়া উঠিতেছেন বুঝা যায়।' আর যাবে কোথা? পরদিনই ঘাড়মুড় ভাঙ্গিয়া ডেঙ্গুর আক্রমণ। সেই যে চোখ লাগিল, তাহাতেই বিপত্তি ঘটিল। একটা চোখের ওয়াস্তা নহে কি?

শুভানুধ্যায়ীটি একচোখোও বটে; কেননা, তিনি সারার লক্ষণটুকুই বড় করিয়া দেখিলেন, আর দীর্ঘকাল রোগভোগে যে দেহ অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছে, দেখিলে চেনা যায় না, এত রোগা হইয়া গিয়াছি, সে দিকে তাঁহার নজর পড়িল না। লোকটি বোধ হয় optimist, সব জিনিশের ভাল দিক্‌টাই দেখেন। অথবা খোসখবর দিয়া আমাকে খুসী করিতে, আমার চমক লাগাইতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার শুভ ইচ্ছার জন্য অবশ্য আমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, কিন্তু শনির দৃষ্টির মত তাঁহার দৃষ্টিই যে আমাকে কাবু করিয়া ফেলিল, সে কথাও তো ভুলিতে পারিতেছি না, আমি যে সেইটাই বড় করিয়া দেখিতেছি। 'যেখানে ব্যথা, সেইখানেই হাত।'

৫। ঝিঙ্গের ঝোলে বৈচিত্র্য [৬]

[ছানার জল বা 'হোয়ে' (whey) ও দুধসাগুর সঙ্গে সঙ্গে যখন মুখের একটু 'যুত' করিবার ইচ্ছায় কোনওরূপ 'নোন্‌তা' খাইবার জন্য উমেদারি করিতে লাগিলাম, তখন সদাশয় ডাক্তার বাবু মুলা, ডুমুর, কাঁচা পেঁপে, খোসা

---

(৬) এইটি ও ইহার পরবর্ত্তী তিনটি আমার 'খেয়াল' নহে; যে ডাক্তার বাবু চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাঁহারই খোসগল্প। তবে রোগীর ঔষধ-পথ্যের ন্যায় যখন তিনি এই খোসগল্প কয়টিও আমার রোগের উপলক্ষেই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তখন এগুলি আমারই সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে। অন্ততঃ এই লম্বোদরের (সম্প্রতি রোগভোগে কৃশোদরের) লেখনী-সাহায্যে এগুলির নরলোকে প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয়। বহু শাস্ত্রীয় উপাখ্যানই তো অপরের মারফত প্রচারিত হইয়াছে, এইরূপ প্রসিদ্ধি।

ও বীচি ফেলিয়া (ল্যাজামুড়া বাদ দিয়া !) কচি পটোল, ও পল্‌তা, এই পাঁচ আনাজের নিরামিষ ঝোল, পল্‌তার ঝোল ও সুক্ত খাইবার অনুমতি দিলেন ; তবে শুধু ঝোলটুকুই পেটে পড়িবে, আনাজগুলি নহে, এ বিষয়েও সাবধান করিয়া দিলেন—(বাবাজীর পাঁঠার মাংস একধারে সরাইয়া রাখিয়া ঝোলের বাটিতে চুমুক দেওয়ার ন্যায়)। ইহা নিতান্ত একঘেয়ে হইবে, এই-রূপ মৃদু আপত্তি করাতে তিনি বুঝাইয়া দিলেন, 'ইহাতেই যথেষ্ট রকমারি (variety) হইবে' এবং সেই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত গল্পটি করিলেন।]

"এক মুন্‌সেফ বাবু সস্তার সওদা হিসাবে নিত্য 'অথদ্ধে' ঝিঙ্গের ঝোল খাইতেন। তাঁহার এক জন বন্ধু এক দিন তাঁহাকে বলিলেন, 'ভাই, রোজ রোজই এক আনাজ খাও, একঘেয়ে লাগে না ?' মুন্‌সেফ বাবু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'এক ঝিঙ্গেকেই কোনও দিন ফালা ফালা করিয়া কুটি, কোনও দিন চাকা চাকা করিয়া কুটি, কোনও দিন ডুমো ডুমো করিয়া কুটি, এতেই তো দিন দিন রকমারি হয়। আর কি চাই ?' বন্ধুবর নিরুত্তর।"

গল্পটি বলিয়া ডাক্তারবাবু উচ্চ-হাস্য করিতে করিতে উঠিয়া গেলেন। কিন্তু আমার পলতার স্মরণে 'তিতায় তিতিল দেহ।'

৬। 'গিরিশ যদি থাক্‌ত ?'

[যখন ঝোলের একধাপ উপরে আনাজে উঠিয়াছি, পেঁপের ডাল্‌না, ডুমুরের ডাল্‌না, নিমুয়ার ঘণ্ট, পটোল-ভাতে খাইতে অনুমতি পাইয়াছি, তখন এক দিন ডাক্তার বাবুর কাছে আরজি পেশ করিলাম, 'একটু যদি নৈনিতাল আলু-ভাতে খেতে পেতাম।' তিনি অবশ্য বুঝাইলেন, 'আলু আর বিলিতী কুমড়ো পেট গরম করে, হজম হ'তেও কষ্ট, ও সব তো চল্‌বে না।' আমি বলিলাম, 'তা' বটে, তবু।' এই 'তবু' শুনিয়া তিনি বলিলেন।]

"আপনার দেখ্‌ছি, সেই গিরিশের পিসির মত হ'ল। পিসির বাড়ী একটা পেয়ারা-গাছ ছিল। যখন তখন এসে পাড়ার ছোঁড়ারা পেয়ারা পাড়্‌ত। বুড়ী তাড়া দিলে তা'রা কেয়ার্‌ করত না। নিরুপায় হ'য়ে বুড়ী তাদের ভয় দেখাবার জন্যে বল্‌ত, 'দাঁড়া তো রে, গিরিশকে ডাকি।' ছেলেরা বল্‌ত, 'সে কি পিসি মা? গিরিশ তো কল্‌কাতায় কালেজে পড়্‌তে গিয়েছে।' পিসি মা তখন আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বল্‌তেন, 'তা' বটে, বাবা, তা' বটে, কিন্তু—গিরিশ যদি থাক্‌ত?' আলুও যদি আপনার খেতে থাক্‌ত!"

৭। 'পাল্‌কী উঠাও—জাহান্নম্‌ যাও।'

[দুর্ব্বল শরীরে হাঁটিতে কেন, উঠিয়া দাঁড়াইতে পারি না, অথচ ডাক্তার বাবুর অভিমত—নির্ম্মল বায়ু সেবন না করিলে শরীর শীঘ্র সুস্থ হইবে না; এই জন্য তিনি আমাকে সকালে-বিকালে পাল্কী চড়িয়া ভিক্টোরিয়া পার্কে গিয়া তথায় ঘণ্টা খানেক করিয়া শুইয়া বসিয়া থাকিতে পরামর্শ দিয়া নিম্নলিখিত গল্পটি তুলিলেন।]

"জেলার 'মেজেষ্টার্‌' সাহেব বেজায় স্থূলকায়, স্বাস্থ্যের দিকে খর নজর, হাওয়া খাওয়া রীতিমত চাই; কিন্তু না পারেন হাঁটিতে, না পারেন ঘোড়ায় বা সাইক্লে চাপিতে। ব্যবস্থা হইল, পাল্কী চড়িয়া প্রাতে বায়ুসেবন করিবেন। সাহেবের দুইটি বুলি, পাল্কীতে উঠিয়াই বলেন, 'পাল্কী উঠাও', আর বেহারারা 'হুজুর, কাঁহা লে যায়ে গা' জিজ্ঞাসা করিলে হুকুম ঝাড়েন, 'জাহান্নম্‌ যাও।' সাহেব দিব্য আরামে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়াছেন, বেহারারা গুরুভার-বহনে গলদ্‌ঘর্ম্ম, অথচ থামিবার, বোঝা নামাইবারও হুকুম মিলে না। এই রকম করিয়া রোজ ৬টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত বেচারারা হায়রান। যে দল এক দিন

আসে, সে দল আর দ্বিতীয় দিন আসে না। কিন্তু নাজির পেশকার আবার এক দল সন্ধান করিয়া আনে। কিছুদিন এই ভাবে চলিল। শেষে অতিষ্ঠ হইয়া বেহারারা এক যুক্তি করিল। পরদিন তাহারা সাহেবকে ঘণ্টা খানেক বহিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিল, 'হুজুর, আউর কাঁহা লে যায়ে গা,' তিনি তাঁহার সেই বাঁধা বুলি আওড়াইলেন। তাহারা সটান একটা মজা বিলে পাল্কী লইয়া গিয়া যেন পা হড়কাইয়া পড়িয়া গিয়াছে, এই ভান করিয়া সাহেবকে একেবারে কাত করিয়া ফেলিয়া দিয়া, যেন বেয়াকুবের মত দাঁড়াইল। সাহেব একে স্থূলকায়, তাহাতে 'মগ্নঃ পঙ্কে সুদুস্তরে,' 'পঞ্চতন্ত্রে'র হাতীর মত দশা হইবার উপক্রম। অনেক চেষ্টায় বেহারারা তাঁহাকে টানিয়া ছেঁচড়াইয়া শুক্না ডাঙ্গায় তুলিল। সেই দিন হইতে সাহেবের জাহান্নমে যাইবার সাধ ফুরাইল, পাল্কী চড়ার সখও মিটিল।" ৭

৮। 'তুম্ হাম্‌সে বহুৎ জাস্তি কর্‌কে কাঁঠাল খায়া ?'

"'মেজেষ্টার্' সাহেব সখ করিয়া 'নয়া চিজ' পাকা কাঁঠাল খাইয়া গোঁফদাড়ীতে কাঁঠালের আঠা লাগাতে বিব্রত হইলেন। পেশকারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি উপায়ে আঠা উঠে। সে সরিষার তেলের কথা বলিল। 'সাহেব' তো ও (ন্যাস্‌টি, Nasty) নোংরা জিনিশ কিছুতেই ছুঁইবেন না। শেষে গোঁফদাড়ী কামাইয়া অব্যাহতি পাইলেন।

"কিছুদিন পরে পেশকারের পিতৃশ্রাদ্ধে সাহেব নিমন্ত্রিত হইলেন। সভাস্থ হইয়া তিনি দেখিলেন, পেশকারের শুধু গোঁফদাড়ী নহে, মস্তক পর্য্যন্ত

(৭) এই গল্প-সম্বন্ধে লেখকের একটু খোঁকা আছে। প্রবল-প্রতাপ 'মেজেষ্টার্' সাহেবকে বিপন্ন করিয়া বেহারারা কি এত সহজেই পার পাইল ? তবে এ সব আপত্তি তুলিলে গল্পের রসভঙ্গ হয়।

মুণ্ডিত, কেবল কাঁঠালের বোঁটার মত স্থূল একগোছা চুল মাথার মধ্যস্থলে রহিয়াছে। সাহেব কুশাগ্রীয়ধী, চট্ করিয়া ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া সপ্রতিভ-ভাবে বলিলেন, '(Well) ওয়েল্, পেশকার, তুম্ হাম্‌সে বহুৎ জাস্তি কর্‌কে কাঁঠাল খায়া ?' কাঁঠাল না খাইলে যে মানুষের এ রকম তেলগোল করিয়া কামাইবার প্রয়োজন হয়, ইহা অবশ্য সাহেবের বুদ্ধির অগম্য।"

[লেখকের দৌহিত্রের ফোড়া অস্ত্র করিবার সময় বালককে অন্য-মনস্ক করিবার উদ্দেশ্যে উপস্থিতবুদ্ধি ডাক্তারবাবু পাকা কাঁঠালের প্রসঙ্গ তুলিয়াছিলেন, পূর্ব্বের গল্পগুলির মত লেখককে পথ্য দেওয়ার প্রসঙ্গে নহে। যাক্, পাকা কাঁঠাল খাইতে না দিলেও (কাশীতে উহা অখাদ্য) করুণাসিন্ধু ডাক্তার বাবু লেখককে সুপক্ক বোম্বাই ও ন্যাংড়া আম, পাকা পেঁপে এবং লিচু, তরমুজ, খরমুজার সরবত এলাহি খাইতে দিয়াছিলেন (বেলের সরবত, আনারসের সরবতের তো কথাই নাই)। এমন সুব্যবস্থা কয়জন ডাক্তারে করে? ভোজনবিলাসী রোগীর ধাতটি তিনি ঠিক ধরিয়াছিলেন। তাই প্রথম প্রথম রাশ টানিয়া ধরিলেও তাহার পরে সময় বুঝিয়া নানা মুখরোচক খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যদি দিন পাই তো গুণের ডাক্তার বাবুর কথা সময়ান্তরে বিস্তারিত-ভাবে বলিব।]

[কিন্তু সে কথা বলি বলি করিয়া আর বলা হইল না। তাই এখন সংক্ষেপে সারিতে হইতেছে। কোথায় যেন পড়িয়াছিলাম (বোধ হয় মার্কিন্ ডাক্তার ও লেখক Holmes হোম্‌সের একখানি পুস্তকে) যে আদর্শ ডাক্তারকে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতে দেখিলেই রোগীর নাড়ী সুস্থ হইয়া উঠে, রোগ-যন্ত্রণার উপশম হয়, রোগীর তাঁহার উপর এতই বিশ্বাস। এ কথা আমার এই চিকিৎসক-সম্বন্ধে খুবই খাটে। তাঁহার বিজ্ঞতা, ধীরতা, অমায়িকতার কথা কখনও ভুলিতে পারিব না। তিনি চিকিৎসা করিয়াই, রোগীর শয়ন-ভোজন সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়াই

ক্ষান্ত হন নাই, নিজের ঘর হইতে প্রবাসস্থ রোগীর প্রয়োজন-সাধনের জন্য ফীডিং-কাপ্ বেড্-প্যান্ প্রভৃতি দ্রব্য পর্য্যন্ত সরবরাহ করিয়াছেন। চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর মধ্যে এমন সহৃদয় পরোপকারী সজ্জন কয়জন মিলে? খোস-গল্প বলিয়া ও অন্যান্য উপায়ে রোগীর প্রফুল্লতা-বিধানের চেষ্টার কথা প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছি। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাঁহার নাম-ধামও এই সঙ্গে উল্লেখ করিতেছি। (আশা করি উদার-প্রকৃতি ডাক্তারবাবু ইহা অনধিকারচর্চ্চা মনে করিয়া রুষ্ট হইবেন না, কৃতজ্ঞতার নিদর্শন বিবেচনা করিয়া তুষ্ট হইবেন।) তাঁহার নাম—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন লাহিড়ী (অবসর-প্রাপ্ত সিভ্ল্ সার্জ্জান্)। মদনপুরা মহল্লায় বড় রাস্তার উপর রায় বাহাদুর ৺কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ীর বিরাট্ অট্টালিকার পার্শ্বেই একটি দ্বিতল বাটীতে থাকেন। তিনি দীর্ঘায়ুঃ হইয়া সুস্থদেহে প্রসন্নমনে বহুবৎসর ধরিয়া আমার ন্যায় বিপন্ন রোগীর আরোগ্য-বিধান করুন, ৺বিশ্বেশ্বরের নিকট এই ঐকান্তিক প্রার্থনা।] (পুস্তকাকারে প্রকাশ-কালের মন্তব্য)।

৯। ঘর-জামাই

জামাই-জাতটা খুব মানী, অল্পেতেই তাঁহাদের রাগ-অভিমান হয়, 'পাণের থেকে চূণ খসিলেই' শ্বশুরবাড়ীর সকলকে প্রমাদ গণিতে হয়; এই জন্যই পণ্ডিতজনে বলিয়া থাকেন, 'জামাতা দশমো গ্রহঃ।' [৮] একটুতেই বাবাজীরা ফোঁস করিয়া উঠেন—যেন জাতসাপ, গোখুরা। কিন্তু ঘর-জামাইএর সে তেজ, সে ঝাঁঝ, সে রোক, সে দর্পদম্ভ কিছুই

(৮) 'কচিত্ তুষ্টঃ কচিদ্বক্রী কচিত্ তুষ্টমিচ্ছতি।
কন্যারাশিং সদা ভুঙ্ক্তে জামাতা দশমোগ্রহঃ॥'

থাকে না, 'বরটি নয় যেন চোরটি!' [৯] একেবারে বিষ হারাইয়া ঢোঁড়া—যেন সাপুড়ের ঘরের বিষদাঁত-ভাঙ্গা গোখুরা।

সরীসৃপের সহিত তুলনা করাতে আশা করি, এই সম্প্রদায় রাগ করিবেন না। একটি চল্‌তি হিন্দী প্রবচনে ইঁহাদিগকে চতুষ্পদের কোঠায় ফেলিয়া 'চৌঠা কুত্তা ঘর-জামাই' [১০] বলা হইয়াছে। আমি তো তাহার তুলনায় 'ভেতো' বাঙ্গালীর ভাষায় অনেক কম করিয়া বলিলাম। হিন্দী করিয়া বলিলেই যে গালাগালিতে জোর ধরে!

[অন্য 'খেয়াল'গুলির, লেখকের পীড়ার ব্যাপারের সহিত একটা না একটা যোগসূত্র আছে। প্রত্যেকটির বেলায় যথাস্থানে তাহার ইঙ্গিত করিয়াছি। কিন্তু রাজা চার্ল্‌সের মাথার মত ('King Charles's head') 'ঘর-জামাই' এই 'খেয়াল'গুলির ভিতর কি করিয়া ঢুকিল, তাহার কোনই হদিশ পাইলাম না। যা হোক্‌, খস্‌ড়ায় 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং লেখকে দোষো নাস্তি কশ্চন।' এইটা দিয়া নবরত্নের নয় (৯) মিলিল; তবে পীড়ার সহিত এটার যোগ না থাকাতে যদি পাঠক এটাকে নাকচ করেন, তা' বেশ, এটা নয় (নহে); নবরত্নের স্থলে (অষ্টরম্ভা নহে) অষ্টবসু মিলিল; বসু-শব্দেরও গো শব্দের মত 'নানা অর্থ অভিধানে ভণে,' তন্মধ্যে একটি অর্থ 'রত্ন' (স্বয়ং 'বসুমতী'ই তাহার প্রমাণ)। অতএব পাঠক আশ্বস্ত হউন, পূজার বাজারে তাঁহার রত্নলাভই বজায় থাকিল।

---

(৯) 'হবির্বিনা হরির্যাতি বিনাপীঠেন মাধবঃ।
কদন্নৈঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ॥'

এই শ্লোকটি বোধ হয় অনেকে জানেন। এই চারি জামাইএর মধ্যে ধনঞ্জয়ই আদর্শ (domesticated) 'গৃহজামাতা।' তবে সংস্কৃতভাষায় রচিত শ্লোকে যাহাই থাকুক, শ্বশুরবাড়ীর লোকে তাচ্ছিল্য করিয়া এই ঘরজামাইটিকে নিশ্চিতই 'ধনা' বলিত। ইতি সুধীভির্বিভাব্যম্‌।

(১০) 'পহেলা কুত্তা কুত্তা পালে, দোসরা কুত্তা ঘর ঘর ডোলে।
তেসরা কুত্তা বহিন-ঘর ভাই, চৌঠা কুত্তা ঘর-জামাই॥'

দাড়ী-মাহাত্ম্য [১]

('মাসিক বসুমতী', কার্ত্তিক ১৩৩০)

'রোগ-শয্যার খেয়ালে' 'ক্ষৌরকর্ম্ম ও নির্ব্বেদ'-প্রসঙ্গে বলিয়াছি, দাড়ী ব্রাহ্ম-খ্রীষ্টান্-মুসলমানের চিহ্ন। (২৩ পৃঃ দেখুন)। বোধ হয়, জ্বরের ঘোরে বেশ একটু বেহুঁস অবস্থায় ফস্ করিয়া এই বেফাঁস কথাটা বলিয়া বসিয়াছি। পরে ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, কথাটা ধোপে টেঁকে না, অথবা পণ্ডিতী ভাষায়, বিচারসহ নহে। কেননা, হিন্দুর পরমারাধ্য সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং স্বয়ম্ভূরই অর্থাৎ খোদ বিধাতা পুরুষেরই চতুর্ম্মুখ শ্মশ্রুসমাকুল। 'পিতামহে'র বদনমণ্ডল দাড়ী না থাকিলে মানায়ও না। এখনও সেই নজিরে ঠাকুরদাদারা দাড়ী রাখেন, নাতী-নাতনীরা লম্বা দাড়ী-গোঁফ দেখিয়া কখনও ভয়ে অভিভূত, কখনও ভক্তিতে পরিপ্লুত হয়, আবার কখনও ভালবাসার আতিশয্যে উহাতে টান দিয়া পুলকিত হয়—যদিও 'নীতিবোধে'র ভেকের গল্পের মত, এক পক্ষের কৌতুক অপর পক্ষের সাঙ্ঘাতিক। কোনও কোনও ছবিতে রুদ্ররূপী মহাদেবের

---

(১) এই প্রবন্ধ-প্রকাশের দশবৎসর পূর্ব্বে লেখকের সতীর্থ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় ('নব্যভারত', আষাঢ় ১৩২০) 'দাড়ীর কথা' প্রচার করেন। সে সময়ে উহা পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছিলাম। পরে উহার কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। বর্ত্তমান প্রবন্ধ-প্রকাশের পরে আমার পুত্র উক্ত প্রবন্ধের কথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। রকমারি দাড়ী-সম্বন্ধে 'বড় হও ত দাড়ী রাখ'-শীর্ষক একটি সচিত্র বিচিত্র প্রবন্ধ 'সচিত্র শিশিরে' (অগ্রহায়ণ ১৩৩০) বাহির হইয়াছে। কৌতূহলী পাঠককে এই প্রবন্ধদ্বয় সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি। (পুস্তকাকারে প্রকাশকালের মন্তব্য)।

মুখমণ্ডলেও দাড়ী দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয়।[২] মহাযোগী মহাদেবের জটাকলাপের সহিত শ্মশ্রুরাজি বেশ মিশ খায়, সন্দেহ নাই। তাহার পর, সেকালে (সত্যযুগে) মুনি-ঋষিদিগের অযত্নসংবর্দ্ধিত সুদীর্ঘ শ্মশ্রু থাকিত। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া যাঁহারা যোগনিরত, তাঁহারা ক্ষৌরকর্ম্মের অবসর পাইবেন কখন্? সুতরাং তাঁহাদিগের জটাপাকান চুল ও 'জীর্ণকূর্চ্চ' অর্থাৎ পাকা দাড়ী। অবশ্য সত্যযুগের সঠিক সংবাদ আমরা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অবগত নহি, কিন্তু এ কালের যাত্রার আসরে ইহার পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়,—নারদ মুনির লম্বা পাকা দাড়ী সকলেরই সুপরিচিত। ভারতচন্দ্রের প্রসাদাৎ জানিতে পারি, ঋষিদের ক্ষৌরকর্ম্মের অবসর-অভাবে দাড়ী গজাইত। শুধু তাহা নহে, তাঁহাদের কাহারও কাহারও দাড়ীর সখও বিলক্ষণ ছিল। অত্র প্রমাণং যথা,—দক্ষযজ্ঞধ্বংসকালে শিবকিঙ্করগণ 'ভার্গবের **সৌষ্ঠবের** দাড়ী-গোঁফ ছিণ্ডিল।' এখন কলির প্রকোপে মুনি-ঋষিরা লোপ পাইয়াছেন, কিন্তু এখনও বহু হিন্দুসন্তান রোগবালাই দূর করিবার উদ্দেশ্যে 'বাবার দাড়ী' (তারকেশ্বরের মানত) রাখেন। সুতরাং দাড়ী হিন্দুর নিতান্ত নিজস্ব সামগ্রী, ইহা ব্রাহ্ম-খ্রীষ্টান্-মুসলমানের চিহ্ন বলিয়া তিন ফুঁয়ে উড়াইবার বস্তু নহে। (আজকাল এক শ্রেণীর না-গৃহী না-সন্ন্যাসী—না-ঘরকা—না-ঘাটকা দেখা দিয়াছেন, তাঁহারা ধোপার কড়ির স্বাশ্রয় করিবার জন্য গেরুয়া পরেন আর নাপিতকে ফাঁকি দেওয়ার মতলবে দাড়ী রাখেন। তাঁহাদিগের কথা এ প্রসঙ্গে ধর্ত্তব্য নহে।) যাহা হউক, দাড়ীর নিন্দা করিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছি।

(২) সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর ৺ অন্নদাপ্রসাদ বাগচির অঙ্কিত 'মহাদেবঃ সতীদেহং স্কন্ধে নিধায় নৃত্যতি'র ছবি। অন্নদামঙ্গলে গৌরীর 'পাকাদাড়ী বুড়া বর' ঘটাইব বলিয়া নারদ শাসাইতেছেন ও নারীদিগের শিবনিন্দায় 'বুড়ার দাড়ী শণের নুড়ী' বলিয়া আক্ষেপ আছে।

এক্ষণে অপরাধক্ষমাপণ-স্তোত্রপাঠ ভিন্ন উপায় নাই। যে মুখে একবার 'চ্যাংমুড়ী কাণী' বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছি, সেই মুখেই 'জয় ব্রহ্মাণী' বলিয়া স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। জয় শ্মশ্রু-বাবার (শ্বশ্রূ-মাতার নহে) জয়!

দাড়ী পুরুষত্বব্যঞ্জক, শৌর্য্যবীর্য্যের বাহ্য বিকাশ, সিংহের কেশরের সহিত একপর্য্যায়ভুক্ত। তবে ইহা 'ক্বচিৎ ক্বচিৎ ব্যভিচারী' ছাগীর গলায় যথা দাড়ী। অর্থাৎ কোন কোন ক্ষেত্রে (যথা শেক্‌স্‌পীয়ারের ২।১ খানি নাটকে) যে নারীর দাড়ীর বার্ত্তা শুনা যায়, সে কলির ধর্ম্ম, ব্যভিচারের উদাহরণ; ঐ সকল ক্ষেত্রে সে 'মেয়ে পুরুষের বাবা'। আর এই উদ্ভট ঘটনা 'অবলা প্রবলা'র দেশের; আমাদের এই নির্বীর্য্য পুরুষের দেশে নারীর বড় জোর গোঁফের কথা ক্বচিৎ শ্রুতিগোচর (নয়নগোচর?) হয়। যাক্, আর এ সব কুৎসার কথায় কায নাই।

সত্য কথা সরাসরিভাবে স্বীকার করাই ভাল, 'প্রাগহং যৌবন-দশায়াম্' বয়োধর্ম্মবশতঃ সযত্নে দাড়ীর চাষ করিয়াছিলাম, যদিও অধুনা লাঙ্গূলহীন শৃগালের দশায় উপনীত হইয়া দাড়ীর নিন্দা করিয়াছি। আমাদের বংশে ইহার বড় একটা রেওয়াজ নাই; কেবল এক জন পিতৃব্যের দেখিয়াছি; তিনি পুলিসের লোক ছিলেন, তাই বোধ হয়, আমাদের বংশগত শিষ্ট শান্ত আকৃতিকে পুলিসোচিত পরুষত্ব দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই কার্য্য করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ আমার যৌবনকালের দাড়ী 'নরাণাং মাতুলক্রমঃ' নিয়মের নিদর্শন। কেননা, পরম হিন্দু পূজনীয় মাতুল মহাশয়ের (ভাগলপুর কলেজের প্রথম প্রিন্সিপ্যাল্ ৺হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের) এককালে দাড়ী ছিল। পরে মদ্‌বর্ণিত নির্ব্বেদের দশায়, (পূর্ব্বপ্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, ২৪ পৃঃ) দাড়ী গোঁফ উভয়েরই উচ্ছেদ হয়। আমিও এত কালে মাতুল মহাশয়ের ধারা বজায় রাখিয়াছি। তবে আমার দাড়ী ঠিক নির্ব্বেদের প্রভাবে যায় নাই, গিয়াছিল গ্রীষ্মকালে

মুখমণ্ডলে ফোড়ার জ্বালায়। অবশ্য শত্রুপক্ষ সে সময়ে টিটকারী দিতে ছাড়েন নাই যে, টালার হাঙ্গামার দরুণ আমি দাড়ী ফেলিয়া পরিত্রাণ পাই। দাড়ী ফেলা ঠিক উক্ত ঘটনার সমকালেই ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু উহা 'কাকতালীয়'-ন্যায়ের (post hoc, ergo propter hoc) উদাহরণ বই আর কিছুই নহে। এতৎপ্রসঙ্গে এ কথা অস্বীকার করিবার যো নাই যে, চেহারার জন্য দাড়ী রাখার অবস্থায় এ পক্ষ কখনও কখনও মুসলমানের দ্বারা 'মিঞা সাহেব' বলিয়া অভ্যর্থিত হইয়াছেন এবং কাবুলী মেওয়াওয়ালার উচ্ছিষ্ট গড়গড়া টানিতে সাদরে আহূত হইয়াছেন। হয় তো দাড়ী ফেলার মূলে সে লাঞ্ছনার স্মৃতিও পরোক্ষভাবে ছিল। এ সব sub-conscious selfএর কথা, মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্মতত্ত্ব, মদ্‌বিধ ক্ষুদ্র-প্রাণ 'কেবল'-সাহিত্যিকের বোধাতীত। যাহা হউক, যখন দাড়ীর নিন্দা করিয়াছিলাম তখন নিজের পূর্ব্বকথা বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সংস্কৃতবাগীশ বলিবেন, 'আত্মচ্ছিদ্রং ন জানাসি', আর মেয়েলি ভাষায় বলিবে, 'আপনার পানে চায় না' ইত্যাদি। যাক্, নিজের বকেয়া হালের পুরাতন কাসুন্দি না ঘাঁটিয়া অতঃপর শ্মশ্রুধারীদিগের নামগুণানু-কীর্ত্তন্ করিয়া পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নাতিদীর্ঘ দাড়ী এবঞ্চ প্রভুপাদ ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বা জটিয়া বাবার দীর্ঘ দাড়ী ও নিবিড় জটা, অশেষ-বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তির উদ্রেক করে। শুধু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কেন, আদর্শ ব্রাহ্মণ শুদ্ধসত্ত্ব গৌরকান্তি সৌম্যমূর্ত্তি উন্নতদেহ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সুদীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রু দেখিলে প্রাচীন ঋষিদিগের কথা মনে পড়িত। ঋষি রবীন্দ্রনাথ তথা তাঁহার অগ্রজগণ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর,[৩] ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর,[৩] তথা

(৩) পুস্তকাকারে প্রকাশকালে উভয় ভ্রাতাই পরলোকগত।

৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় পিতৃধারা বজায় রাখিয়াছেন। আবার ৺বলেন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর যৌবনে পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন। ৺রাজনারায়ণ বসুর আকৃতি-গাম্ভীর্য্যে ও দাড়ীর নিবিড়তায় সিংহসম তেজস্বিতা প্রকাশিত হইত। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র শ্বশুরের ধারা পাইয়াছেন। ব্রাহ্ম-সমাজের নহে, থিয়সফিষ্ট্-সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ, ত্রয়োদশ বার্ষিক সাহিত্য-সম্মিলনের দর্শন-শাখার সভাপতি, সম্প্রতি পরলোকগত ৺পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহের শ্বেতশ্মশ্রুও শোভায় অতুলনীয় ছিল। ক্যানিং লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা ৺যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদজ্ঞ ৺উমেশচন্দ্র গুপ্ত—এতদুভয়কে সুদীর্ঘ শ্বেতশ্মশ্রুর জন্য বেশ মুনিগোঁসাইএর মত মানাইত। বেদজ্ঞানের কথা যখন উঠিল, তখন সেকালের ৺ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী ও একালের ৺বহুবল্লভ শাস্ত্রী এই দুই জন বেদবিদের দাড়ীও এক্ষেত্রে স্মর্ত্তব্য। পণ্ডিত ৺শিবনাথ শাস্ত্রী, ভাই ৺প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও ৺দুর্গামোহন দাস—ব্রাহ্মসমাজের এই ত্রিমূর্ত্তিও শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখযোগ্য।

বাঙ্গালীর সেরা ব্যারিষ্টার্ মিষ্টার্ ডব্লিউ সি বোনার্জ্জির জমকালো দাড়ী তাঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তির সর্ব্বাংশে উপযোগীই ছিল। পদ-পসারে সমান সমান না গেলেও দাড়ীর বহরে ও বাহারে, তথা প্রতিভা ও চরিত্র-গৌরবে, ব্যারিষ্টার্ ৺আনন্দমোহন বসুও কম যাইতেন না। দানশৌণ্ড স্যার্ তারকনাথ পালিতের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গের বাগ্মিপ্রবর শ্রীযুক্ত [৪] সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (আমাদের যৌবনকালের হীরো ম্যাট্‌সিনি বাঁড়ুয্যে, ও আজকালকার মিনিষ্টার্ স্যার্ সুরেন্দ্রনাথ) ও পূর্ব্ববঙ্গের বাগ্মিবর ৺অম্বিকাচরণ মজুমদার—বক্তৃতাবাজ এই যুড়ীর দাড়ীর জোরে বক্তৃতার তোড় আরও বাড়িয়া যাইত। দেশসেবক শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর

(৪) পুস্তকাকারে প্রকাশকালে পরলোকগত।

চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় দাড়ীধারী বক্তৃতাকারীর শেষ-মেষ। কিন্তু এখন দেশের হাওয়া ফিরিয়াছে, দাড়ী নাড়িয়া বক্তৃতা দিয়া ভারত-উদ্ধার আর চলে না, আসর আর জমে না, তাই চিত্তরঞ্জন ও বিপিনচন্দ্র মুণ্ডিতগুম্ফশ্মশ্রু। রাষ্ট্রনীতির পিচ্ছিল পন্থাঃ পরিহার-পূর্ব্বক আধ্যাত্মিক বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিয়া শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ পরমহংসদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া শ্মশ্রুধারণ করিয়াছেন শুনিয়াছি।

সাহিত্যের আসরে প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে, বাঙ্গালা-সাহিত্যের নবযুগের প্রবর্ত্তয়িতা 'মেঘনাদ-বধ'-রচয়িতা মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের দিকে ; 'হেলেনা'-কাব্যের রচয়িতা ৺আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রতিভায় না হইলেও দাড়ীর দৈর্ঘ্যে 'হেক্টরবধ'-কাব্যের রচয়িতার পার্শ্বে স্থান পাইবার উপযুক্ত। একাধারে বঙ্গের শেক্‌স্‌পীয়ার্‌ ও গ্যারিক্‌ ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষও এক্ষেত্রে স্মর্ত্তব্য। 'ফুলজানি'র জনক ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার শেষটা গুম্ফশ্মশ্রুহীন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাদর আহ্বান 'লয়ে দাড়ী, লয়ে হাসি, অবতীর্ণ হও আসি', শ্রীশচন্দ্রের দাড়ীকে অমরত্ব দিয়াছে। ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর,[৫] ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর,[৫] সর্ব্বকনিষ্ঠ কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, পণ্ডিত ৺শিবনাথ শাস্ত্রী, ৺রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি সাহিত্যিকের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। সাময়িক সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'নব্যভারতে'র লেখক ৺রসিকলাল রায় এবং 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র লেখক শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায়[৫] দাড়ীর কদর রাখিয়াছেন।

সম্পাদক-মহলে দাড়ীর দণ্ডকারণ্য দাঁড়াইয়াছে। 'সাধারণী'-সম্পাদক ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বিরাট্‌ বপুঃ দাড়ীর দৈর্ঘ্যের দরুণ বেশ জম-জমাট ছিল। 'বঙ্গবাসী'র ৺বিহারীলাল সরকার ওরূপ 'ব্যুঢ়োরস্কো

(৫) পুস্তকাকারে প্রকাশকালে ইঁহারা পরলোকগত।

বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ' না হইলেও দাড়ীর ভারে কায হাসিল করিয়া গিয়াছেন। 'সঞ্জীবনী'র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমা'র মিত্রের নাম 'নরাণাং শ্বশুরক্রমঃ'-হিসাবে একবার গ্রহণ করিয়াছি। 'নব্যভারতে'র ৺দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর নাম এক্ষেত্রে স্মর্ত্তব্য। 'প্রবাসীর' শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের লম্বমান দাড়ী 'প্রবাসী'র প্রচারের পরিমাণের পরিমাপক। চারুচন্দ্রও এককালে দাড়ীধারী ছিলেন। 'সন্দেশে'র সরবরাহকার ৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর স্মৃতি এই প্রসঙ্গে উজ্জীবিত হয়। 'বসুমতী'র শ্রীমান্ হেমেন্দ্রপ্রসাদ, তথা বর্ষীয়ান্ শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বাবুকে ভুলিলে প্রত্য-বায়গ্রস্ত হইতে হইবে।

নিজে শিক্ষাব্যবসায়ী হইয়া শিক্ষা-বিভাগের দিকে না চাহিলে ঠিকে-ভুল হইবে। সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য—দেশ-মাতৃকার সুসন্তান সদা সমাজহিতরত চিরকুমারব্রত উৎসাহে চিরযৌবনধারী চিররুগ্ণ কর্ম্মযোগী জ্ঞানযোগী স্যার্-উপাধি-লাঞ্ছিত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তাহার পরেই উল্লেখযোগ্য—দীর্ঘ কর্ম্মকালের পর অবসরভোগী শ্রীযুক্ত রসময় মিত্র রায় বাহাদুর। তিনি যখন ভক্তিপ্রেমায় গদ্‌গদ হইয়া দাড়ী নাড়িয়া কীর্ত্তন-অঙ্গ ধরেন, তখন বাস্তবিকই তাঁহাকে বাবাজী বাবাজী বলিয়া ভ্রম হয়। 'রামকৃষ্ণ কথামৃত'-সংগ্রহকার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সুদীর্ঘ শ্মশ্রু পরমহংসদেবের ভক্ত শিষ্যেরই সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত। ডক্‌টর্ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ডক্‌টর্ হীরালাল হালদার, প্রিন্সিপ্যাল্ ক্ষুদিরাম বসু—এই দার্শনিক-ত্রয়ের আনাভিপ্রসারী দাড়ীর দৈর্ঘ্য তাঁহাদিগের দার্শনিকতার গভীরতার সমান অনুপাতে। শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,[৬] শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন রায়,[৬] শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চট্টোরাজ—এই ত্রিমূর্ত্তির লম্বা দাড়ী প্রথম বাঙ্গালী র‍্যাংলার্ (wrangler) ৺আনন্দমোহন বসুর ন্যায় প্রগাঢ় গণিতজ্ঞানের

(৬) পুস্তকাকারে প্রকাশকালে উভয়েই পরলোকগত।

সাক্ষ্যদান করে। দাদার দেখাদেখি শ্রীমান্ মুক্তিদারঞ্জনও ঐ পথের পথিক। ফলতঃ খোদ বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে যদিও গোঁফদাড়ী মায় মাথার আধাআধি পর্য্যন্ত কামাইতেন, তথাপি তাঁহার কলেজের আবহাওয়া দাড়ী-গজানর পক্ষে খুবই অনুকূল বলিয়া ধারণা হয়। সাক্ষী—শুধু একালের কেন, সেকালের প্রিন্সিপ্যাল্ শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অধিকারী (বিদ্যাসাগর-জামাতা) ও ব্যারিষ্টার্ মিঃ এন্ ঘোষ, উক্ত কলেজের বহুবৎসরের একনিষ্ঠ সেবক, পরে সেন্ট্র্যাল্ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম বসু ; এমন কি, সংস্কৃতভাষার অধ্যাপক, আমাদের ছাত্রজীবনে ৺ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ীকে ও পরে শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পর্য্যন্ত ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। পক্ষান্তরে, সিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল্ ৺ উমেশচন্দ্র দত্তের গুম্ফশ্মশ্রুর অভাব ও বর্ত্তমান প্রিন্সিপ্যাল্ শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্রের শ্মশ্রুর অভাব ভাইস্-প্রিন্সিপ্যাল্ চট্টোরাজ মহোদয় মায় সুদ পূরণ করিয়াছেন।

রীপন্ কলেজের (লর্ড রীপনের দাড়ী ছিল) খোদ মালিক (?) সুরেন্দ্রনাথের দাড়ীর কথা পূর্ব্বেই প্রসঙ্গান্তরে উল্লিখিত হইয়াছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ অমৃত বাবুর অ-মৃত অবস্থায় মুখমণ্ডল শ্মশ্রুশোভিত ছিল—তিনি রীপন্ তথা সুরেন্দ্রনাথের মান রাখিয়াছিলেন, কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল্-পরম্পরায় ও পাট নাই, মাতব্বর প্রোফেসার্-মহলেও উহার রেওয়াজ নাই। সেকালের কৃষ্ণকমল বাবু হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিবেদী মহাশয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয়, 'অভয়ের কথা'র প্রচারক ক্ষেত্রবাবু, সকলেই মুণ্ডিত-মুখমণ্ডল। এটা খোদ সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র প্রতিরোধ না কি ?

দুঃখের সহিত বলিতে হয়, আমাদের কলেজে শ্রদ্ধাস্পদ প্রিন্সিপ্যাল্ মহাশয় যে 'example set' করিয়াছেন তাহা সাঙ্ঘাতিক। শাস্ত্রে বলে

'যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তদেবেতরো জনাঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥'

দাড়ীর তো কথাই নাই, ইদানীং কয়েক বৎসর হইতে তিনি নির্ব্বেদ-বশতঃ গোঁফ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন। 'সাবধানের বিনাশ নাই'—এই নীতি অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান লেখক তাঁহার পদাঙ্ক (ক্ষুরাঙ্ক বলিলে উৎকট শ্লেষের মত শুনায়) অনুসরণ করিয়াছেন—পাছে শারীরিক অপটুতার অজুহাতে চাকরী যায়। [৭]

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালী ভাইস্‌দিগের মধ্যে কেহ দাড়ীধারী ছিলেন না, ইহা অনেকের পক্ষে একটা আপশোষের বিষয় ছিল (অর্থাৎ দাড়ীধারী ডিগ্রীধারীদিগের একটা grievance ছিল)। সদাশয় লর্ড লিটন্ সে আপশোষ দূর করিয়াছেন। তবে মাননীয় বসুজা মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়বাহুল্যের পরিবর্ত্তে ব্যয়-সঙ্কোচে অবহিত হইবেন, তাহারই অসন্দিগ্ধ প্রমাণ—নিজের দাড়ী পর্য্যন্ত কাঁচি চালাইয়া কাটাছাঁটা, কেয়ারি করা![৮] (আচ্ছা, স্যার্ আশুতোষ সরস্বতীর দাড়ী থাকিলে কিরূপ মানাইত? ওঃ হরি, আমারই যে বিসমোল্লায় গলদ। সিংহের কেসর থাকে, 'বেঙ্গল টাইগারে'র কেসর থাকে না, থাকে বিপুল গুম্ফ ও প্রখর নখরদশন, তাহার আঘাতে ব্রিটিশ্-সিংহ পর্য্যন্ত জর্জ্জরিত!)

---

(৭) এই প্রবন্ধ বঙ্গবাসী কলেজ্ ইউনিয়নের (৪ঠা অক্টোবরের) অধিবেশনে লেখক-কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল। সাধারণের নিকট নীরস বিবেচিত হইবে বলিয়া উক্ত কলেজের ২।৪ জন অধ্যাপকের নাম মুদ্রণকালে পরিত্যক্ত হইল।

(৮) বসু মহাশয় এক্ষণে পরলোকগত। অধুনা আবার শ্মশ্রুহীন বাঙ্গালী উক্ত আসনে আসীন। দাড়ীধারী ডিগ্রীধারীদিগের সুখের স্বপন অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। (পুস্তকাকারে প্রকাশকালের টিপ্পনী।)

'তেরোস্পর্শ'

(বড়দিনের সওগাত)

('মাসিক বসুমতী', অগ্রহায়ণ, ১৩৩০)

[কাশীতে এবার যেমন প্রচণ্ড গরম, তেমনই (reaction) প্রতিক্রিয়া-হিসাবে পচা বর্ষা, তেমনই প্রবল বন্যা ; গঙ্গার জলবৃদ্ধির জন্য 'ইন্দ্রদমন', 'পুষ্কর' ও 'কুরুক্ষেত্র' কাণ্ড ; বর্ষা, বন্যা ও পূর্ব্বগামী গ্রীষ্মের প্রকোপে ডেঙ্গু, উদরাময় ও ফোড়া ('গরমি-গোটা' heat-boils or mango-boils) ; লেখক নিজে এ তিনে তো ভুগিয়াছেন, আবার গ্রীষ্ম, কুইনিন্ ও পশ্চিম-মুখো ঘরে বাস, এই ত্রিতাপও সহিয়াছেন ; সর্ব্বত্র এই তিনের প্রভাব অনুভব করিয়া প্রবল রোগযন্ত্রণার মধ্যে 'তেরোস্পর্শে'র খেয়াল মাথায় চাপিয়াছে। পূজার বাজারে পাঠকদিগকে নবরত্ন উপহার দিয়াছি ; এটি দশম রত্ন, বড়দিনের সওগাতের জন্য রাখিয়াছি—কেননা, এটি দমে ভারী, নয়টির বোঝার উপর শাক-আঁটিটা হিসাবে চড়ান চলিত না। তা, নবরত্নের উপর দশমে দোষ কি ? 'অধিকন্তু ন দোষায়'—বিশেষতঃ রত্নের বেলায় ! দশম রত্ন দরে চড়া। অন্যে পরে কা কথা, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও কালিদাসের কালে জন্ম হইলে 'দশম রত্ন' হইতে বাঞ্ছা করিয়াছিলেন।—ইতি মুখবন্ধ।]

তিন তিথি একদিনে পাড়িলে পঞ্জিকাকার তাহাকে বলেন 'ত্র্যহস্পর্শ।' সে দিনে যাত্রা নাস্তি, শুভকর্ম্মও নিষিদ্ধ। 'বিবাহ-যাত্রা-শুভ-পুষ্টিকর্ম্ম সর্ব্বং ন কার্য্যং ত্রিদিনস্পৃশে তু।'[১] (অবশ্য, নিত্যকর্ম্ম, সন্ধ্যাহ্নিক,

---

(১) পঞ্জিকায় আর একটি সদৃশ শব্দ আছে—'ত্রিস্পৃশা'—একাদশী-বিশেষ। তিন তিথি একাদশীর দিনে পড়িলে 'হরিভক্তিবিলাস'-মতে তাহাকে বলে 'ত্রিস্পৃশা।'

পূজা-জপ, যাগ-হোম, আহার-নির্হার, নিষিদ্ধ নহে। সে দিনে মা-বাপের শ্রাদ্ধ পড়িলে তাহাও স্থগিত থাকিবে না ; আর সে দিনে মড়া মরিলেও তাহাকে 'বাসিমড়া' করিয়া রাখা চলিবে না।) ইহা শনির শেষ ও বৃহস্পতির শেষ অপেক্ষাও সাঙ্ঘাতিক, কেননা, শুধু একবেলা আধবেলার ওয়াস্তা নহে, সমস্ত দিনটা ধরিয়াই দোষাশ্রিত। অশ্লেষা-মঘা দুই ভগিনীই কেবল ইহার সমান খুঁটের। ডি, এল্ রায় 'বিষ্যুৎবারের বারবেলা'র গান বাঁধিলেন, ত্র্যহস্পর্শের বেলায় বাঁধিলেন না কেন? বোধ হয়, 'দুর্জ্জনকে দূর হ'তে করি পরিহার' এই নীতি অবলম্বন করিয়া 'ত্র্যহস্পর্শ'কে ঘাঁটাইতে সাহস করেন নাই। বেপরোয়া বিলাত-ফেরতাও যাহাকে ডরান, সে বড় সহজ পাত্র নহে। (শনির শেষও ভয়াবহ; গজানন, নারায়ণ প্রভৃতি দেবগণ পর্য্যন্ত রবিনন্দনের হাতে নাকাল হইয়াছেন। তাই পূর্ব্বোক্ত কবি 'বিষ্যুৎবারের বারবেলা'র মত শনিবারের বারবেলা লইয়া 'উচ্চবাচ্য' করেন নাই।)

কিন্তু আবার বাঙ্গালা 'তেরোস্পর্শ' দেবভাষার 'ত্র্যহস্পর্শ' অপেক্ষাও ব্যাপক ব্যাপার। ইহা শুধু কালবাচক নহে। পল্লীসমাজে দলাদলির ঘোঁটে, বা হাল চাল, মামলার সলা-পরামর্শে, তিন মাথা একত্র হইলে, আর দশজনে গা-টেপাটিপি করে, 'এই রে তেরোস্পর্শ ঘুটেছে।' বস্তুতঃ 'তিন' সংখ্যাই যেন আতঙ্কের বস্তু। [মানুষ দুইএর সঙ্গে আজন্ম নিবিড়ভাবে পরিচিত, যেহেতু, তাহার দুই কাণ, দুই চোখ, দুই নাসারন্ধ্র, দুই হাত, দুই পা (দুই নৌকায় নহে)। দুই উতরিয়া অজানা তিনের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে তাই কি আতঙ্ক?]

এইবার তিনের ভয়ঙ্করত্বের প্রমাণ দিই।

নারায়ণ বামন-অবতারে বলি-রাজার নিকট ত্রিপাদভূমি যাজ্ঞা করিয়াই বিভ্রাট্ ঘটাইয়াছিলেন। আবার কৃষ্ণ-অবতারে ত্রিভঙ্গমূর্ত্তি ধরিয়াই

গোপীর কুল মজাইয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে পরশুরাম-অবতারে তিনবার নহে, ৩×৭=২১ বার (ত্রিসপ্তকৃত্বঃ), পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। ত্রিলোচনের ত্রিশূলাস্ফালন সংহারের সূচনা করে। ত্রিপুরাসুর, ত্রিজটা রাক্ষসী, ত্রিশিখ-ত্রিশিরাঃ ইত্যাদি রাক্ষসের নামে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ত্রিশঙ্কুর স্বর্গারোহণ সঙ্কট-সঙ্কুল। মেনকার মাতৃ-হৃদয়ে তিন দিনের আনন্দ সুখের বটে, কিন্তু তাহার পরেই যে 'সুখস্যানন্তরং দুঃখম্', 'হরিষে বিষাদ', 'যত হাসি তত কান্না', ইহা প্রণিধান করিবেন। পুত্র অবর্ত্তমানে তেরাত্তিরের শ্রাদ্ধ—সুতরাং ইহাও সুখের বিষয় নহে। ত্রিপক্ষ শ্রাদ্ধও নিতান্ত অপার্য্যমাণে। তিন ব্রাহ্মণে যাত্রা নিষিদ্ধ, (সঙ্গে এক শূদ্র থাকিলে তো সোণায় সোহাগা)। ত্রিতাপজ্বালায় জনন-মরণ-শীল জীব জরজর। 'জন্ম মৃত্যু বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে',—মানুষের হাত নহে। 'তিন সত্য', বা তামা-তুলসী-গঙ্গাজল, এই তিন পবিত্র দ্রব্য স্পর্শ করিয়া শপথ, মা-কালীর দিব্য, গুরুর দিব্য প্রভৃতি কঠিন কঠিন শপথ অপেক্ষা বেশী (binding) জোরালো নহে কি ?

সংস্কৃত-ভাষার ব্যাকরণে তিন লিঙ্গ প্রথম-শিক্ষার্থীর পক্ষে ঘোর বিড়ম্বনা ঘটায়। পাটীগণিতের ত্রৈরাশিক ও জ্যামিতির ত্রিভুজও এ পক্ষে বড় কম যান না। ত্রিকোণমিতির ত্রিভুজের ব্যাপার (solution of triangles) আরওজটিল। 'তিন নয় তিন ছয় তিন আঠারো কত হয় ? [২]' পাটীগণিতের এই বরযাত্রী-ঠকান প্রশ্নও স্মরণীয়। সংখ্যাতত্ত্বে তিনের দোষ কাটাইবার জন্যই বোধ হয় 'রাম দুই সাড়ে তিন' আবৃত্তির প্রথা। জ্বর ত্রিদোষজ হইলে বাঁকিয়া বসে। তেকাঁটা বা তেশিরা মনসা-সিজুর কাঁটার বড় জ্বালা। তেপান্তর (ত্রিপ্রান্তর ?) মাঠে পড়িলে তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফাটে। তেতালার সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। ঢিমে-

(২) উত্তর—এক কম এক শ অর্থাৎ ৯৯।

তেতালা গায়িতে ও বাজাইতেও নাকি বেশ একটু বেগ পাইতে হয়। তিন মেয়ের পর ছেলে, বা তিন ছেলের পর মেয়ে হওয়া অলক্ষণ, মেয়ে-মহলে এইরূপ সংস্কার। তাই 'শৈল' (সৈল=সহিল) নাম রাখিয়া দোষ কাটানর প্রথা আছে। নিশির ডাকের তিন ডাকের পরে বিপদ্ থাকে না। তিন কুলে কেহ না থাকা, তিনকাল গিয়া এককালে ঠেকা, ত্রিভুবন শূন্য দেখা, ত্রিশূন্যে অবস্থান, প্রবলের ত্রিসীমা মাড়ান, কোনটাই ভাল নহে। 'তেমাথা' পথে 'ঠ্যাকনা' করে, তেকাঠায় ঠেকা বড় দায়, 'তেএঁটে' মাথা সকলের চক্ষুঃশূল, 'তেথাকি' ভুঁড়ি বিদ্রূপের বস্তু। (ঈর্ষ্যারও নহে কি ?) তিন পিণ্ডে প্রেতাত্মা তৃপ্ত হয়, তিন ঝাঁটায় ভূত ছাড়ে, তিন চড়, বা তিন থাপ্পড়, বা তিন তাড়ায় বাঁকা লোক সিধা হয়, আর তিন ফুঁয়ে সোজা লোককে উড়াইয়া দেয়; 'তিন নয় তিন ছয়' করিয়া ফেলা লক্ষ্মীছাড়ার লক্ষণ, 'তিন টপকায়' কায সারা ব্যস্তবাগীশের ধরণ, আর 'পুরাতন ভৃত্য'—

"একখানা দিলে নিমেষ ফেলিতে তিনখানা ক'রে আনে।
তিনখানা দিলে একখানা রাখে বাকী কোথা নাহি জানে।"

যম জামাই ভাগনা, তিন নয় আপনা। ওল কচু মান, তিনই সমান। বাদল বামুন বান, দক্ষিণে পেলে যান। শনির সাত মঙ্গলের তিন, আর সব দিন দিন। সবই তিনের ওড়ন-পাড়ন।

'তিন তাস' খেলা জুয়াখেলারই প্রকারভেদ। বার বার তিনবার নিষেধ (warning) রূপেই বেশী প্রচলিত। তিন তিন বার ফেল্ হইলে লজ্জায় মুখ দেখান যায় না। পক্ষান্তরে, তিন তিনটা পাশ্ (অর্থাৎ বিএ পাশ্) বেটার বিয়ে দিয়ে বরের মায়ের দেমাক দেখে কে ?

এই 'ত্রির' সঙ্গে শব্দ-সাদৃশ্য থাকাতেই বোধ হয় 'স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী', 'স্ত্রিয়শ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ', আর

এই সবের জন্যই শাস্ত্রে বলে, 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।' ('স্ত্রীভাগ্যে পুরুষের ধন,' 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি,' 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু,' 'স্ত্রিয়োদেবাঃ স্ত্রিয়ঃ প্রাণাঃ স্ত্রিয় এব বিভূষণম্,' এগুলি বোধ হয় 'উপচার-পদ', স্ত্রীজাতির মন ভুলানর জন্য সৃষ্ট।)

আরও দেখুন, 'তিন শত্তুর' কাহাকেও দিতে নাই। (আমার মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর মুখ-শুদ্ধির জন্য তিনটি পাণ বরাদ্দ দেখিয়া আমার একটি নবাগতা ছোট্ট ভাগ্নী বলিয়াছিল, "মামীমা, মামাবাবু কি তবে শত্তুর? তাঁকে তিনটি পাণ দেন যে!") 'এই তিন শত্তুর' ঘুচাইবার উদ্দেশ্যেই কি দেশীয় কলেজের কর্ত্তারা, অল্প বেতনে দরিদ্র ছাত্রের উচ্চশিক্ষার প্রবর্ত্তয়িতা উদারচেতাঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নির্দ্দিষ্ট ছাত্র-বেতন তিন টাকার জায়গায় ৪৲ টাকা করিয়াছিলেন? এবং বৎসর বৎসর ব্রহ্মোত্তরের বেড়া বদলাইয়া জমী-বৃদ্ধির ন্যায়, প্রতি বৎসরই এক টাকা এক টাকা করিয়া বাড়াইতেছেন? ক্রমে টিকিট্ পোষ্ট্-কার্ডের মূল্যের ন্যায় ডবল্ করিয়া তুলিয়াছেন, তবুও নিবৃত্তি নাই। সরকারের উপরও এক কাটি! জানি না, ইহার শেষ কোথায়? আশ্চর্য্যের বিষয়, বেতনের হার যত উচ্চ হইতেছে, গজকচ্ছপের শরীর-বৃদ্ধির ন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বী কলেজ্‌গুলির ছাত্রসংখ্যাও ততই বাড়িয়া যাইতেছে।

আবার দেখুন, গোলদীঘি লালদীঘি হেদুয়ার মত 'তিনকোণা তলাও' (Wellesley Square) এই তিনের ফেরে পড়িয়া (অনুপ্রাস-সত্ত্বেও) লোকপ্রিয় (popular) হইতে পারিল না। এই কারণে সাহিত্যক্ষেত্রে ত্রৈমাসিকেরও অনাদর। ঐ একই কারণে দুই জনে বিন্তী-খেলার ও চারি জনে গ্রাবু প্রভৃতি খেলার যেমন রেওয়াজ, তিন জনে ডাক-বুরুজ খেলার তেমন রেওয়াজ নাই। থ্রী-কাস্‌ল্ সিগারেট ভারতের মুখ-অগ্নির ব্যবস্থা করিয়া বিলাতের পেটের জ্বালা শীতল

করিতেছে। বাইসিক্লে চড়া শক্ত কায, তাই বালকের অবলম্ব ট্রাইসিক্ল্ ত্রিচক্রযান। ধনে মানে জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হইলে 'ত্রিবেদী' ঠাকুর সকলের শ্রদ্ধাভাজন সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি যখন বুদ্ধিবিদ্যা-ব্রহ্মণ্যের বদলে কেবল লাঠি-লোটা-কম্বল সম্বল করিয়া দরওয়ানী করিতে আসেন, তখন তিনি দ্বিবেদী চতুর্ব্বেদীর মত সোজাসুজি দোবে চোবে হন না, বাঁকিয়া বসিয়া 'তেওয়ারি' হইয়া 'তেরিমেরি' করেন!

আবার পূরণেও 'তিন' কম সাজ্ঘাতিক নহেন। বিরূপাক্ষের তৃতীয় চক্ষুই মদনভস্ম করিয়াছিল, বামনের তৃতীয় চরণই বলির বিপত্তি বাধাইয়াছিল; 'মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থাঃ'ও এই প্রসঙ্গে স্মর্ত্তব্য। গুণের মধ্যে তমোগুণ তৃতীয়, সুতরাং 'বিদ্যার বিদ্যা'র ন্যায় 'গুণ হ'য়ে দোষ হ'ল'। ৩নং রেগুলেশান্ যে কি সাংঘাতিক ব্যাপার, তাহা আবার নূতন করিয়া সন ১৩৩০ সালে মালুম হইতেছে। নীলামের তৃতীয় ঘায়ে কা'রও সর্ব্বনাশ, কা'রও পৌষ মাস। তৃতীয় পক্ষে বিবাহ অলক্ষণ বলিয়া আগে ফুলগাছের সঙ্গে সাতপাক ঘুরাইয়া লইয়া পরে তৃতীয় পক্ষকে চতুর্থ পক্ষ বলিয়া চালান হয়। তৃতীয় শ্রেণীর রেল্‌গাড়ীর আরোহীর দুর্গতির সীমা নাই, তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রকে ভর্ত্তি করিতে বহু কলেজ্ নারাজ, এমন কি, তৃতীয় শ্রেণীতে এম্, এ পাশ্ হইলে কলেজে চাকরী পাওয়া দুর্ঘট; third-rate intellect বলিয়াই যেন ইঁহাদিগকে ধরিয়া লওয়া হয়। (ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই জাত্-ব্যবসার কথায় আসিয়া পড়িলাম—talking shop!)

তিনের অন্ত নাই। ধর্ম্ম অর্থ কাম ত্রিগণ বা ত্রিবর্গ, সত্ত্বরজস্তমঃ ত্রিগুণ, আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আধিভৌতিক ত্রিতাপ, 'মনোবুদ্ধিরহঙ্কারঃ' ত্রিতত্ত্ব, ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্না তিন নাড়ী, বায়ু পিত্ত কফ দেহস্থ তিন

ধাতু, উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত-ভেদে বৈদিক উচ্চারণ, হ্রস্বদীর্ঘপ্লুত স্বর-বর্ণের তিন প্রকার উচ্চারণ, উদারা মুদারা তারা গানের তিন গ্রাম, তৌর্য্যত্রিক অর্থাৎ নৃত্য-গীত-বাদ্য, দৈর্ঘ্যপ্রস্থবেধ, 'বোধোদয়ে' তিন প্রকার পদার্থ, পদার্থের কঠিন জলীয় বাষ্পীয় তিন প্রকার অবস্থা, চর্ব্বচূষ্যলেহ্য তিন প্রকার খাদ্য (পেয় স্বতন্ত্র), তিন প্রকার ভগ্নাংশ, তিন মাসে কোয়ার্টার্ ও ইংরেজী ঋতু (4 seasons), টাকা আনা পাই, তেল লুণ লকড়ি, জমাখরচ বা জমা ওয়াশিল বাকী, বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যা, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ, কাশী কাঞ্চী দ্রাবিড়, ইংল্যাণ্ড্ স্কট্ল্যাণ্ড্ আয়ার্ল্যাণ্ড্, (tricolor flag), আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, এং বেং চেং, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিলোক, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকাল—সর্ব্বত্রই তিন বর্ত্তমান। এত তিনের মধ্যে কোন কোন স্থলে গোলেমালে তিন ভালও হইয়া গিয়াছে। যথা, পতিতপাবনী সুরধুনী, ত্রিমার্গগা, ত্রিস্রোতা বা ত্রিধারা হইয়া, ত্রিলোক পবিত্র করিতেছেন। গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী, 'ত্রিবেণী' যুক্ত বা মুক্ত, উভয় অবস্থায়ই মহামুক্তিদা, পরন্তু স্নানে পর্ব্ববিশেষে ত্রিকুল কেন, ত্রিকোটিকুল উদ্ধার করেন। গঙ্গা-অসি-বরণা-সঙ্গমে কাশী সকল তীর্থের রাণী। আর গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী-সঙ্গমে প্রয়াগ তীর্থরাজ। অক্ষয়-তৃতীয়ায় সত্যযুগোৎপত্তি, ত্রেতাযুগ, ভূর্ভুবঃস্বঃ, তিন প্রধান বেদ, তিন উচ্চবর্ণ (আর্য্য), সত্যং শিবং সুন্দরম্, স্বর্গবর্গে ত্রিদিব-স্ত্রিদশালয়ঃ, ত্রিবিষ্টপ বা ত্রিপিষ্টপ, ত্রিমূর্ত্তি, ত্রিবিক্রম, ত্র্যম্বক, ত্রিপুরারি, ত্রিলোচন, ত্রিনয়না, ত্রিনাথ, ত্রিবিদ্যা বা ত্রয়ী, ত্রিসন্ধ্যা, ত্র্যক্ষর প্রণব, শৈবের ত্রিপত্র ও ত্রিপুণ্ড্র, বৈষ্ণবের ত্রিকণ্ঠী ও ত্রিভঙ্গমুরারি, গৌরনিতাই অদ্বৈতপ্রভু, নামে রুচি জীবে দয়া বৈষ্ণব-সেবন, ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ, ক্ষীর সর নবনী, ধড়া চূড়া পাঁচন-বাড়ী, শ্রীদাম সুদাম সুবল-সখা, ললিতা বিশাখা বৃন্দা সখী, গায়ত্রীদেবীর তিন মূর্ত্তি ধ্যান, তিন বার শ্রীবিষ্ণু উচ্চারণ-

পূর্ব্বক আচমন, তিন গণ্ডূষ গঙ্গাজলপান, তিন ফেরতায় এক দণ্ডী ও এইরূপ তিন দণ্ডী পৈতা, ঘৃণা লজ্জা ভয় তিন থাকতে নয়, মনে বনে ও কোণে ধ্যান, তন্ মন্ ধন্, কায়মনোবাক্যে, ৩৩ বা ৩৩ কোটি দেবতা, ত্রৈলঙ্গস্বামী,—এমন কি, বৌদ্ধের ত্রিরত্ন, ত্রিপিটক, খৃষ্টানের Trinity, আদি সাধারণ ও নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ত্রিধারা, সঞ্জীবনীর মটো স্বাধীনতা সাম্য মৈত্রী, এমন কি, হিংটিং ছট্ পর্য্যন্ত—পরম পবিত্র। ত্রেতাবতার রামচন্দ্রের 'নামে কোটি ব্রহ্মহত্যা হরে'। 'সর্ব্বসিদ্ধেস্ত্রয়োদশী' যাত্রিক দিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

বেজায় মিষ্ট হইলেও ত্রিমধু ব্রাহ্মণের পাতে বেশ সাজে, তেহাই দিলে গীত-বাদ্য খুব মজে, আর বাঁয়াতবলা ডুগ্‌ডুগী ঢোলকের চাঁটীর কর্ণ-বধিরকারী শব্দের তুলনায় ত্রিতন্ত্রীর (সেতারের) ঝঙ্কার বড় মধুর বাজে। নারীদেহে ত্রিবলি-রেখায় চক্ষুঃ জুড়ায়, প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে একঘেয়ে পয়ারের পর ত্রিপদীচ্ছন্দে কর্ণ জুড়ায়, 'তেমাথার' পরামর্শে হৃদয় জুড়ায়। বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্নের (৩×৩=৯) আদর, বাঙ্গালা স্কুলে ত্রৈবার্ষিক পাশের কদর, গ্রহদোষ-খণ্ডনে ত্রিলৌহের ও ত্রিরত্নের তথা নবরত্নের[৩] এবং রোগ-প্রশমনে ত্রিকটু ও ত্রিফলার অসামান্য গুণ। দুঃখের বিষয়, ত্রিফলার জলেও রোগশয্যাশায়ী লেখকের উপকার হইতেছে না। অতএব এইখানেই 'তেরোস্পর্শ'কে পরিহার; পাঠক তো পরিত্রাণ পাইলেন, লেখকের ললাটলিপিতে যাহাই লিখিত থাকুক না কেন! [৪] [Three cheers ! Hip hip, hurrah !]

---

(৩) লেখক এই জন্য অঙ্গুরীয়ে ত্রিলৌহ ও ত্রিরত্ন ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন ও নবরত্ন-ধারণেরও পরামর্শ পাইয়াছেন।

(৪) এই উদাহরণমালা-পরিবর্দ্ধনে এবং অন্যান্য প্রবন্ধ-সংশোধনে শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ্ 'কাশীর কিঞ্চিৎ'-কার শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্য পাইয়াছি। তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। (পুস্তকাকারে প্রকাশকালের মন্তব্য।)

রোগশয্যার খেয়াল

২য় কিস্তি

(পৌষ-পার্ব্বণের তত্ত্ব)

('মাসিক বসুমতী', পৌষ ১৩৩০)

'Misery makes sport to mock itself.'—SHAKESPEARE.

[পূজার তত্ত্বে পাঠকবর্গকে নবরত্ন উপঢৌকন দিয়াছিলাম। পৌষের তত্ত্বে ত্রিরত্ন উপঢৌকন দিতেছি! 'তেরোস্পর্শে'র জের ত্রিরত্নই তো সঙ্গত। এক ডজন পূর্ণ হইল। 'তেরোস্পর্শ' (বড়দিনের সওগাত) লইয়া তের রত্ন হইলে এক ডজনকে baker's dozen মনে করিলেই হিসাবের গোল চুকিয়া যাইবে। (লেখকেরও তো এখন 'বেকার' অবস্থা!) রত্নসংখ্যা তের হওয়াতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু নাই; এই তো সে দিন (কার্ত্তিকের) 'মাসিক বসুমতী'তে একুশ রত্নের সন্ধান পাইলাম। ফলতঃ তিন বা নয়ে রত্ন ফুরাইবার কথা নহে। কেন না, বসুমতী অনন্ত-রত্নপ্রসবিনী!]

১। কাশী না কাঁসি?

অন্য অন্য বার কাশীবাস করিতে আসিয়া কাশী চাষ করিয়া ফেলি। (শুনিয়াছি, উদ্ভট বচনও আছে, 'কাশীতে হণ্টনং কুর্য্যাৎ।' এই হাঁটার চোটেই অর্থাৎ 'নিত্যযাত্রা'র ফলেই কাশীর বুড়াবুড়ীদের মার্কণ্ডেয়ের পরমায়ুঃ।) দশাশ্বমেধ-কেদার ঘাটে বৈকালিক বিচরণ তো ঘটেই, বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণা-ঢুণ্ঢিরাজ-শনৈশ্চর-সাক্ষিবিনায়ক এই পঞ্চদেবতার 'প্রাতরেব ইষ্টদর্শনম্' তো বটেই। ইহা ছাড়া আজ দশাশ্বমেধ-ঘাট

শীতলা-ঘাট হইতে ঘাটে ঘাটে অসি-সঙ্গম; কা'ল মণিকর্ণিকা-ঘাট হইতে ঘাটে ঘাটে পঞ্চগঙ্গা-ঘাট (বরুণা-সঙ্গম পর্য্যন্ত ঘাটে ঘাটে হাঁটা ঘটে নাই); পরশু অসি-সঙ্গমে নৃসিংহ-জগন্নাথ-দর্শন; 'তরশু' বরুণাসঙ্গমে আদিকেশব-খড়্গা-বিনায়ক-দর্শন; কোনও দিন পঞ্চগঙ্গা-ঘাটে বিন্দুমাধব-দর্শন (ধ্বজারোহণে কখনও সাহস হয় নাই); কোনও দিন গোপাল-মন্দিরে গোপালবিগ্রহ ও তাঁহার বহুমূল্য আসবাব-দর্শন; কোনও দিন দুর্গা-বাড়ী মেনকার বাড়ী; গুরুধাম, আনন্দবাগ, সঙ্কটমোচন; কোনও দিন অদ্বৈত-আশ্রম, রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম, শান্তিকুঞ্জ, জ্ঞানগেহ, হিন্দুকলেজ্ হইয়া কামাখ্যা-বটুকনাথ-পশুপতিনাথ-বৈদ্যনাথ-শঙ্কর-মঠ-দর্শনান্তে 'গৈবী' পর্য্যন্ত 'ধাওয়া' করা; কোনও দিন নাদেশ্বর-প্রাসাদ ও কুইন্‌স্ কলেজ্; কোনও দিন 'রথতলা' ছাড়াইয়া বহু দূরে রাজা মোতিচাঁদের বাগান, কোনও দিন এক্কারোহণে হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়-পরিদর্শন, ইত্যাদি। ফলতঃ, ঘূরণচক্রের বিরাম থাকে না।

আর এবার কাশীবাস কাশীগ্রাস হইয়াছে (যেমন রাহুগ্রাস কালগ্রাস)। শয়ন-কক্ষের কুক্ষি, রোগশয্যারূপ পূতনার ক্রোড় আমাকে গ্রাস করিয়াছে; 'যাত্রা'য় বাহির হওয়া দূরে থাকুক, বিছানা হইতে গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া পায়ে ভর করিয়া দাঁড়ানও অসাধ্য হইয়াছে। নারায়ণের অনন্ত-শয্যা বা ভীষ্মের শরশয্যা বলিলে ছোট মুখে বড় কথা বলা হয়, (blasphemy) দেব বা দেবকল্প মানবের অবমাননা করা হয়, তাই সে তুলনার কথা তুলিতে ইতস্ততঃ করিতেছি। নারায়ণের যোগনিদ্রা, আর আমার রোগনিদ্রা, না, না, রোগতন্দ্রা; অসহ্য যন্ত্রণার পর মধ্যে মধ্যে অবসাদ-বশতঃ ঝিমুনি আসে; যেমন চোরের রাত্রিবাসই লাভ, তেমনি আতুরের ঐ কাকনিদ্রা-টুকুই (dog-sleep) লাভ। ভীষ্মদেব শর-শয্যায় পড়িয়া কত জ্ঞান-উপদেশ দিয়াছিলেন, কত

তত্ত্বকথা বলিয়াছিলেন—আর আমি 'খেয়াল' ধরিয়াছি (ধ্রুপদ যে এই ক্ষুদ্র শক্তির অতীত), চুট্‌কী-চটক চালাইয়া পাঠকের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতেছি—অন্ততঃ ক্ষণেকের জন্য রোগযন্ত্রণা ভুলিতেছি। গুপ্ত-কবির পাঁঠা যেমন 'আপনি করেন বাদ্য আপনার নাশে', তেমনি আমিও নিজের দুর্দ্দশা লইয়া নিজেই রঙ্গ করিতেছি। (এবারকার উপমাটা বোধ হয় লাগসই হইল!) শেক্‌স্‌পীয়ারের কথাটা বড় পাকা—'Misery makes sport to mock itself.'

এবার কাশীবাস রাহুগ্রাসই বটে। বাস্তবিক, জ্যোতিষীরাও বলিয়াছেন, রাহু আমার প্রতি বিরূপ; 'ক্রূর' কেতুও রাহুর শানাইয়ের সঙ্গে পোঁ ধরিয়াছেন, ইনি যে 'জয়কেতে!' ইহার উপর কুজের কুঁজরোমিও আছে, স্বয়ং মঙ্গল অমঙ্গল ঘটাইতেছেন। ('হা শম্ভু, তুমিও বাম!' 'Thou too, Brutus!') আবার সুরগুরু বৃহস্পতি ও অসুরগুরু শুক্র 'বক্র' হইয়া অর্থাৎ বাঁকিয়া বসিয়া ম্লেচ্ছভাষার 'গুরু মহাশয়' এ অধীনের ঘরশত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন; 'অন্যে পরে কা কথা' অপিচ, চন্দ্র নিজে রাহুগ্রাসের যন্ত্রণা জানিয়াও আমাকে এই রোগগ্রাসে ফেলিয়াছেন। আর সবের সেরা, শনির দৃষ্টিও এই আতুরের উপর পড়িয়াছে। শনি যে-সে নহেন, 'যমাগ্রজ,' সুতরাং তাঁহার প্রতাপ যম-যন্ত্রণার উপরও এক কাঠি উঠিবে, ইহা আর বিচিত্র কি? অথচ জ্যোতিঃশাস্ত্রে নাকি লেখে, শনি ক্লীবগ্রহ। ক্লীবের এই দাপট তুরকী অন্তঃপুরের (Turkish harem) খোজা প্রহরীদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ফলতঃ এতগুলি গ্রহের ফেরে পড়িয়া আমার দশা দাঁড়াইয়াছে—সপ্তরথিবেষ্টিত অভিমন্যুর মত। তাই এবার কাশীবাস আর 'সুখের প্রবাস'[১] নহে, দুঃখের আবাস। কাশীবাস কাশীত্রাস হইয়া পড়িয়াছে।

(১) লেখকের 'ফোয়ারা'য় উক্ত-শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

প্রহ্লাদের যেমন কৃষ্ণনামের আদ্যক্ষর 'ক অক্ষর' শুনিয়া অশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইত, তেমনি এই অধমের কাশীধামের আদ্যক্ষর 'ক অক্ষর' শুনিয়া পুলকসঞ্চার হইত। কিন্তু এবার পুলকের পরিবর্ত্তে আতঙ্কের আবির্ভাব হইতেছে (যেমন জলাতঙ্ক !)। 'যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ।'—এই তো চিরদিন জানিতাম। কিন্তু আমার এবার কাশীতে গতি গতিকে অনন্ত দুর্গতি হইয়া দাঁড়াইল। অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে 'গতি' হইলে ২ তো সদ্গতি অর্থাৎ মুক্তিপ্রাপ্তিই হইত; কিন্তু পাপীর ভাগ্যে এমন সদ্গতি মিলিবে কেন? তাই বলিতে ইচ্ছা হয়, কাশী না ফাঁসি?

২। কাশীতে অগস্ত্যযাত্রা

অগস্ত্য কাশী হইতে অগস্ত্যযাত্রা করিয়াছিলেন, আর আমার কাশীতে অগস্ত্যযাত্রা হইয়াছে। শুভ বৈশাখের পঞ্চম দিবসে এখানে পৌছিয়াছি; আর শ্রাবণ শেষ হইতে চলিল, স্থাণুবৎ অচল হইয়া এখানে আছি। পাকা চারি মাস না হইলেও কাঁচি তো বটে। কাঁচিই বা বলি কেন?

(২) শুনিয়াছি, লেখকের কাশীপ্রাপ্তির গুজবও কলিকাতায় রটিয়াছিল। মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ রটিলে নাকি আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হয়। তাই বুঝি মৃত্যুঞ্জয় জীবনের পাট্টা নূতন করিয়া (fresh lease of life) দিয়াছেন। (মহামৃত্যুঞ্জয়-কবচ-ধারণের ফলেও এরূপ ঘটিতে পারে।) তা' যেরূপ ভুগিয়াছি, অন্য লোক হইলে টিকিত না, যাই কাঠপ্রাণ তাই মরি নাই। 'ভাগ্যে ভাগ্যে রহল পরাণ।' মরিব কেন? মরিলে তো সকল যন্ত্রণা ফুরায়। 'দুঃখ-সংবেদনায়ৈব ময়ি চৈতন্যমাহিতম্।' 'জনম আমার শুধু সহিতে যাতনা।' 'চিরজীবী করিল গোঁসাই।' সে দিন একটি বৈজ্ঞানিক মত দেখিলাম, স্থূলকায় লোক অল্পায়ুঃ হয়। চক্রী এই চিরদুঃখীকে দীর্ঘজীবী করিবার অভিপ্রায়েই সম্প্রতি কৃশকায় করিয়া দিয়াছেন। 'প্রভু বিষম দয়ালু', 'Great are thy tender mercies, O Lord!'

মাসগুলা তো সবই আষাঢ়ান্ত দিনের মত দীর্ঘ, ৩১।৩২ দিনের পাকি ওজনের, কোনটাই সোজাসুজি ৩০ দিনের নহে, কাঁচি ২৮।২৯ দিনের তো নহেই। পৌছানর পরদিন অক্ষয়তৃতীয়া ছিল, সে দিন নাকি সত্যযুগোৎপত্তি। কিন্তু আমার কপালে কলির প্রকোপে সত্যযুগের সুখভোগের পরিবর্ত্তে দুঃখভোগই ঘটিল। কোথায় কাশী-কোতোয়াল কালভৈরব কাশীর উৎপাতগুলাকে (undesirables) ঝাঁটাইয়া কাশী হইতে তাড়ায়, গঙ্গাপার করিয়া দিয়া তবে ছাড়ে, আর আমাকে দেখিতেছি ধরিয়া বাঁধিয়া মারিতেছে। পড়িয়া পড়িয়া মা'র খাইতেছি, চোরের মা'র হজম করিতেছি, নিদারুণ রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। এ যেন নাগপাশে বন্ধন, বত্রিশ বন্ধনে বত্রিশ নাড়ী টন্‌টন্‌ করিতেছে। ক্রূর গ্রহের এমনি নিগ্রহ, অবিরত কেবলই পাক দিয়া বিপাকে ফেলিতেছে। যখনই যাইবার দিন করিতেছি, তখনই একটা না একটা বিঘ্ন ঘটাইয়া দিনটাকে পণ্ড করিতেছে। আর যাত্রিক দিনগুলাও কি লম্বা লম্বা অন্তরে—২৯।৩০ আষাঢ়, ১২।১৩।১৪ শ্রাবণ, ২৩।২৫।২৯।৩১ শ্রাবণ। ইহাও গ্রহের ফের। নিজে যদি মন্দের ভাল হইলাম, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা একে একে শয্যাগত হইতে লাগিল—ফোড়া, ডেঙ্গু, আমাশয়। ফলে, যাত্রা বন্ধ।

বৎসরখানেকের মধ্যে স্বাস্থ্যলাভের জন্য তিন স্থানে গেলাম—গত গ্রীষ্মের ছুটিতে পুরীতে—সেইখানেই রোগের সূত্রপাত করিয়া আসিলাম, পরন্তু পুত্র দুইটি বিষম টাইফয়েড্ জ্বরে আক্রান্ত হইল, সেই অবস্থায় তাহাদিগকে লইয়া ফিরিলাম—ফিরিয়া কি কঠোর শাস্তি পাইলাম, তাহা বলিয়া আর পাঠকবর্গকে মনঃকষ্ট দিব না। তাহার পর, বড়দিনের বন্ধে বাঁকীপুর গেলাম, সেখানে একপক্ষকাল-বাসেই রক্ত-আমাশয় তো আবার চাগিলই, পরন্তু পা ফুলিল, 'গণ্ডস্যোপরি পিণ্ডঃ সংবৃত্তঃ।' মানে মানে

'যঃ পলায়তি স জীবতি' নীতির অনুসরণ করিয়া কলিকাতায় ফিরিলাম। তাল সামলাইতে মাস দুই গেল। একটু সুস্থ হইয়া শরীর সারার জন্য এবার গ্রীষ্মের ছুটি হইতেই কাশী ছুটিলাম। এই 'বার বার তিনবার' বায়ুপরিবর্ত্তনের চেষ্টার শেষবার ফল সবুসে আচ্ছা হইল, যথেষ্ট আক্কেল হইল, অর্থনাশ মনস্তাপ রোগভোগের চূড়ান্ত হইল। তাই এবার সঙ্কল্প করিয়াছি, যো-সো করিয়া একবার কলিকাতা ফিরিতে পারিলে আর নেড়া বেলতলায় যায় না, 'ন গঙ্গদত্তঃ পুনরেতি কূপম্।' [৩] কলিকাতার কূপমণ্ডূক হইয়া থাকিয়া প্রাণবায়ু বাহির হইবার উপক্রম হইলেও আর বায়ুপরিবর্ত্তনে বাহির হইব না। ভরা ভাদর না পড়িতে পড়িতে ভাগ্যে ভাগ্যে ফিরিতে পারিলে বাঁচি। [৪]

৩। শম্বূকের দশা

স্কুলে পড়ুয়া-অবস্থায় তখনকার দিনে প্রচলিত বার্ণার্ড্ স্মিথের এরিথ্‌মেটিকে (চক্রবর্ত্তী চট্টরাজ গৌরীশঙ্কর বিপিন-গুপ্ত তখনও গোকুলে বাড়িতেছেন) snailএর অঙ্ক কষিতে অনেক বেগ পাইতে হইত। তাই এই অকাল-বার্দ্ধক্যে অঙ্কশাস্ত্রের প্রায় আর সব ভুলিয়াছি, কিন্তু উল্লিখিত অঙ্কটি বেশ মনে আছে। (Snail) শম্বূকের অদ্ভুত অভ্যাস—সে রোজ গাছে খানিক করিয়া উঠে, আবার খানিক করিয়া নামে; তবে যতটা উঠে, তা'র চেয়ে কম নামে। (এটা কিন্তু Gravitation অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের ঠিক উল্টা!) সুতরাং সে শেষে এক দিন গাছের আগায়

---

(৩) কাশী শিবের পুরী, আর শিবের বিল্বমূলে বাস। বৃদ্ধকালেশ্বরের কূপের জলও রোগীর জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। জ্ঞানবাপীও স্মর্ত্তব্য। ইতি 'অলঙ্কারেণ বস্তুধ্বনিঃ!'

(৪) পাঠকবর্গ আশ্বস্ত হউন, লেখক মহাশয় ভরা ভাদ্রের পূর্ব্বেই প্রাণে প্রাণে ঠিকানায় পৌঁছিয়াছেন।—সম্পাদক।

উঠিয়াছিল। অঙ্কের প্রশ্ন—এইরূপ উঠানামার হিড়িকে সে কত দিনে গাছের আগায় উঠিবে? (অবশ্য গাছের উচ্চতা ও উঠানামার হার অঙ্কে প্রদত্ত আছে।) অঙ্কটা কষিবার সময় বড় গোলযোগ ঠেকিত। সোজাসুজি বিয়োগ ও ভাগ করিয়া কষিয়া গেলে উত্তরটি বইএর সঙ্গে মিলিত না। কষিবার একটি সঙ্কেত মাষ্টার মহাশয় শিখাইয়াছিলেন—শম্বূক শেষ দিন নামিবে না, অতএব এক দিনের নামার পরিমাণ ছাড়িয়া দিতে হইবে। এই সঙ্কেতে কিন্তু আমার মাথা আরও গুলাইয়া যাইত। শম্বূক শেষ দিন নামে না কেন? তাহার চিরজীবনের অভ্যাস, তাহার জাতীয়-প্রকৃতিগত সংস্কার (instinct) বদলাইয়া যাইবে কেন? উচ্চে উঠিয়া পায়াভারী হইবে? 'নীচঃ শ্লাঘ্যপদং প্রাপ্য' মদগর্ব্বে আর মাটিতে পা দিবে না? আসল কথা, একবার গাছের আগায় পৌছিলে অঙ্কের সমাধান হইল, তাহার পর শামুক নামুক বা উঠুক, বাঁচুক বা মরুক, তাহার সহিত অঙ্কের আর কোনও সম্পর্ক নাই। কিন্তু এ ভাবে মাষ্টার মহাশয় কথাটা কোনও দিন বুঝান নাই। (যাক্, আর গুরুনিন্দা করিব না। এই সব পাপেই তো রোগভোগ দুঃখকষ্ট পাইতেছি। আর পাপের ভরা বাড়াইব না।)

আমারও দশা ঠিক এই শম্বূকের মতই। এক দিন বলসঞ্চয় করিয়া শয্যা ছাড়িয়া উঠিতেছি, আবার পরদিন রোগে পড়িয়া বলক্ষয়ে শয্যাশায়ী হইতেছি। তবে সঞ্চয় বোধ হয় ক্ষয় অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক, নতুবা খাড়া হইয়া উঠিতে, চলিতে ফিরিতে (যদিও টলিতে টলিতে) পারিতাম না। ঠিক শম্বূকের মতই উঠার হার পড়ার হার অপেক্ষা অল্প বেশী। অতি ধীরে ধীরে আরোগ্যের দিকে আগাইতেছি। 'শনৈঃ পন্থাঃ।' যথালাভ।

Snail, snail-slow হইলেও শেষটা গাছের আগায়, গন্তব্যস্থলে, goalএ, পৌছিয়াছিল। আমি কোনও দিন কলিকাতায় পৌছিব কি?

সশরীরে না হইলেও, মনে মনে কলিকাতার পথে খানিক করিয়া আগাইতেছি, আবার রোগে পড়িয়া ধপ্ করিয়া সে পথ হইতে পড়িয়া যাইতেছি। (পুনঃশম্বূক!) জানি না, কবে এ উঠানামার অন্ত হইবে? ৫ শম্বূক হয় তো গাছের আগায় উঠিয়া আবার নামিয়াছিল। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, একবার ঠিকানায় পৌছিলে আর কখনও 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি'—বিবাহের বরযাত্রী হইয়াও নহে, সাহিত্য-সম্মিলনের বর হইয়াও নহে। ৬